Kabikankan Mukundaram Mahavidyalaya

প্রত্যুষ

বার্ষিক পত্রিকা
২০২৪-২০২৫

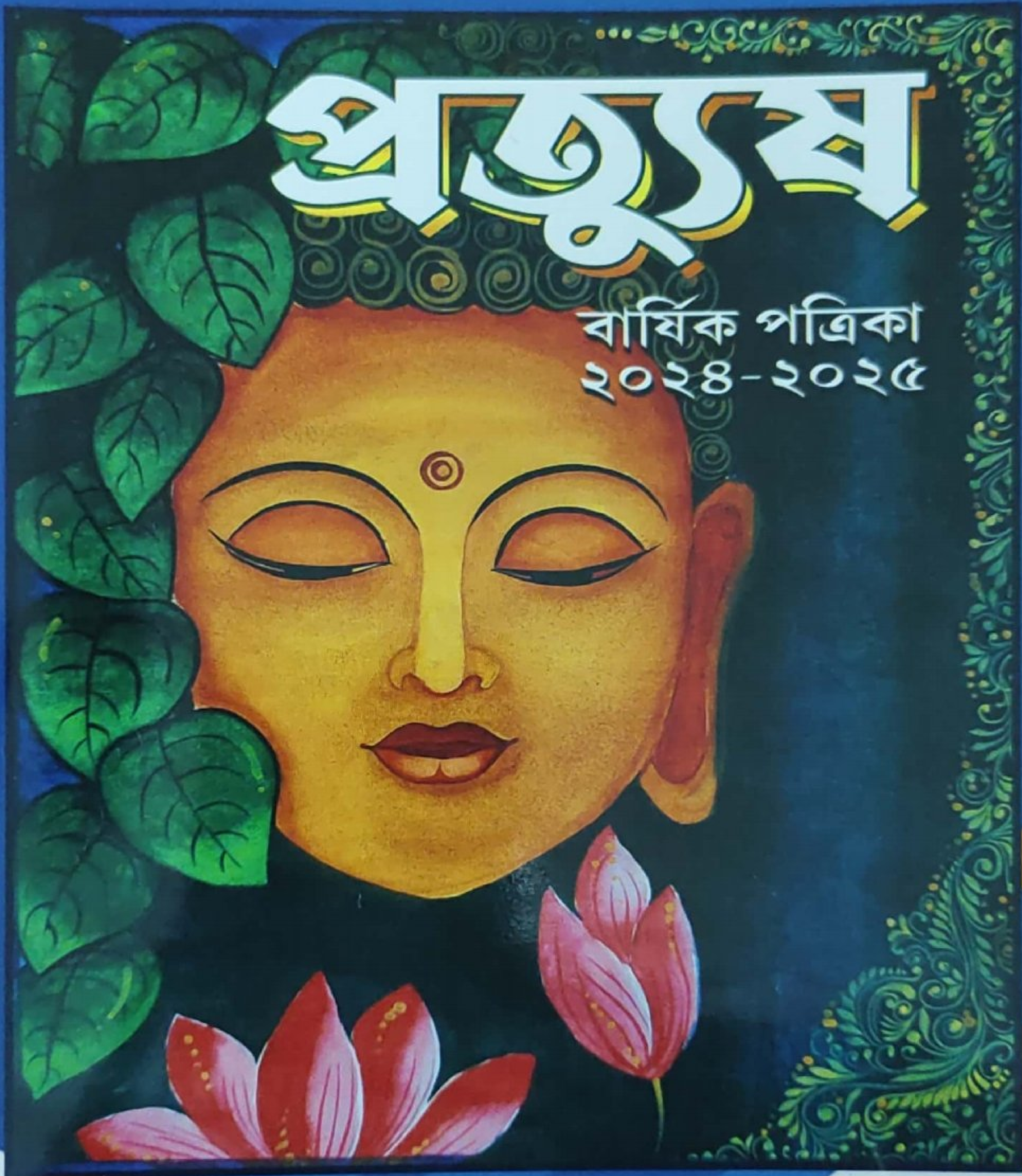

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম
মহাবিদ্যালয়

CERTIFIED ISO 9001:2015 COMPANY

ISO 14001:2015

Affiliated to the University of Burdwan
Keshabpur, Arambagh, Hooghly, 712413

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

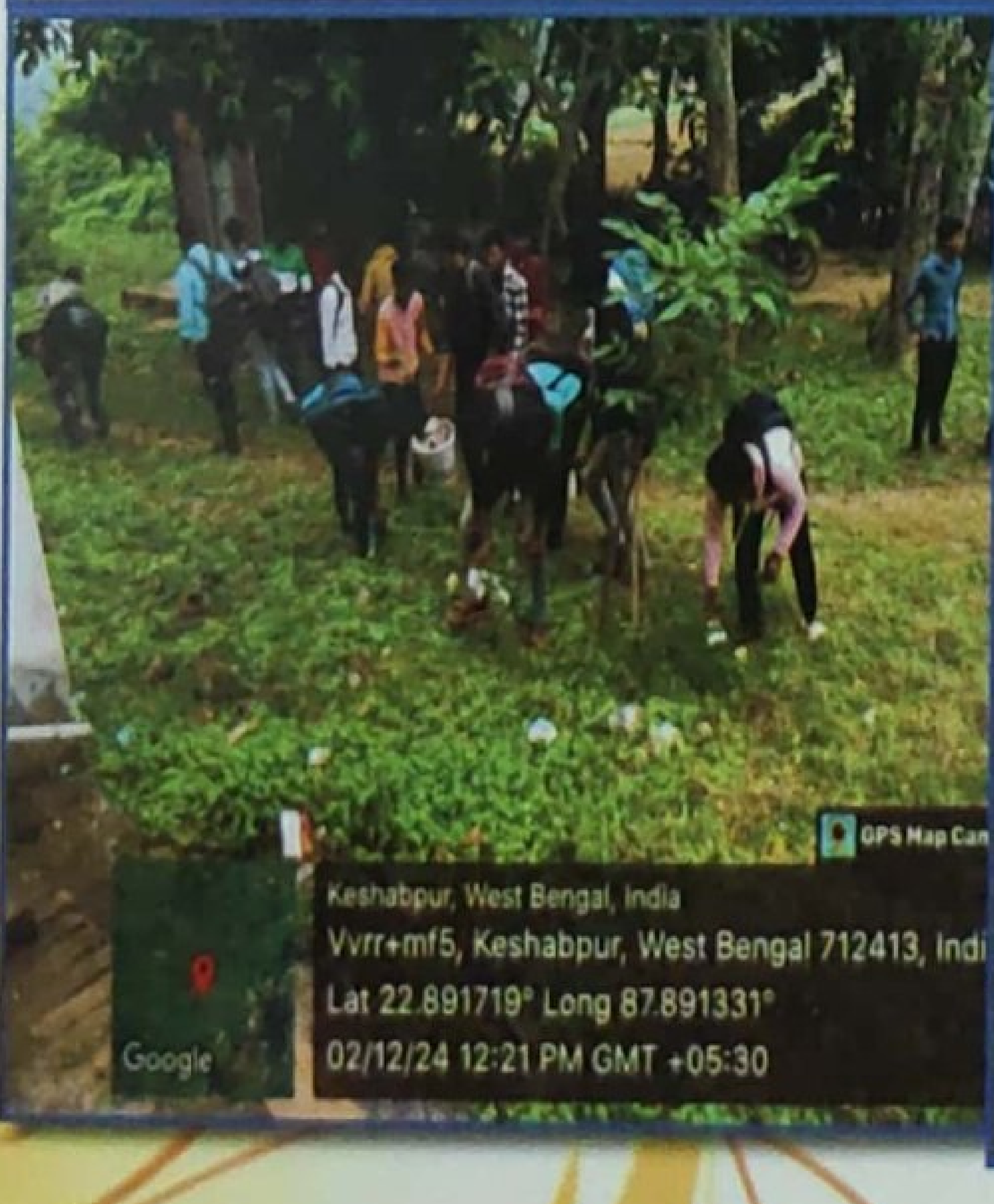

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

KABIKANKAN MUKUNDARAM MAHAVIDYALAYA

প্রত্যয়

2024-25

Campus

Near Keshabpur Bus Stand

Keshabpur, Hooghly, Pin- 712413

Phone: 03211-250660

Website: *http://*

www.kabikankanmukundarammahavidyal

a.org/

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

প্রত্যুষ—তৃতীয় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা

প্রকাশ কাল—ডিসেম্বর, ২০২৪

অনুদান—কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম মহাবিদ্যালয়

প্রকাশক—অধ্যক্ষ, কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম মহাবিদ্যালয়

সম্পাদক মণ্ডলী —

১) শুভ্রশ্রী বেরা (অধ্যাপক প্রতিনিধি)

২) প্রভাত চন্দ্র হাজরা (অধ্যাপক প্রতিনিধি)

৩) ঐতিহ্য কোনার (ছাত্র প্রতিনিধি)

৪) দীপেন শীট—ছাত্র প্রতিনিধি

প্রচ্ছদ—সায়ন দে

মূদ্রন—নিহারিকা প্রিন্টার্স, চাপাডাঙ্গা

অলঙ্করণ—শুভ্রশ্রী বেরা

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় .... পৃষ্ঠা - ৭

অধ্যক্ষের শুভেচ্ছাবার্তা .... পৃষ্ঠা - ৮

পরিচালন সমিতির সভাপতির শুভেচ্ছাবার্তা .... পৃষ্ঠা - ৯

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী : জীবন ও সাহিত্য

ডক্টর নন্দ কুমার পাখিড়া............... .... পৃষ্ঠা - ১০

ছাত্রছাত্রীদের প্রাপ্তি .... পৃষ্ঠা - ১৩

প্রকৃতি বাঁচাও: প্রকৃতি আমাদের বাঁচিয়ে রাখে

অমিত কুমার কুন্ডু .... পৃষ্ঠা - ১৪

নিশিথে পথিক

নাম: আব্দুল আজিম মল্লিক .... পৃষ্ঠা - ১৫

অতৃপ্ত

পুষ্কর মুখার্জী .... পৃষ্ঠা - ১৬

পথভোলা এক পথিক

শিউলি রক্ষিত .... পৃষ্ঠা - ১৮

আমার স্বপ্ন

সুপ্রিয়া পোড়েল .... পৃষ্ঠা - ২০

বিশ্বায়নের যুগে মাতৃভাষার গুরুত্ব

সুবীর পণ্ডিত .... পৃষ্ঠা - ২১

আমি মানুষ

কাজী সাবানা আজমি .... পৃষ্ঠা - ২৩

আরামবাগের কর্মভূমি ও প্রফুল্লচন্দ্র সেন

আব্দুল জামান নাসের .... পৃষ্ঠা - ২৪

মায়া

কৌশিক ঘোষ .... পৃষ্ঠা - ২৫

কল্পতরু

শম্পা মালিক .... পৃষ্ঠা - ২৬

স্বপ্ন মৃত্যুহীন

সহেলী দাশ .... পৃষ্ঠা - ২৭

নবনীতার পরিণয়

নিতাই চন্দ্র মন্ডল .... পৃষ্ঠা - ২৯

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

তারা আর নেয়নি খোঁজ
দেবাশিষ ঘোষ .... পৃষ্ঠা - ৩

স্কুল জীবনের মধুর স্মৃতিমালা
চাঁদতারা খাতুন .... পৃষ্ঠা - ৩

Drawing - My Passion
Name: Bhumika Bag .... পৃষ্ঠা - ৩

খেলাধুলা: সুস্থ জীবনের ভিত্তি
দীপেন শীট .... পৃষ্ঠা - ৩৪

চোখ
নীতিশ কুমার বটব্যাল .... পৃষ্ঠা - ৩৫

ছবি
অন্তরা বন্দ্যোপাধ্যায় .... পৃষ্ঠা - ৩৭

কলেজের ২১৩ নম্বর রুম
গোপাল পণ্ডিত .... পৃষ্ঠা - ৩৮

নায়ক
প্রভাত চন্দ্র হাজরা .... পৃষ্ঠা - ৪২

আঞ্চলিক ইতিহাসে কেশবপুর গ্রাম
সেক আবুল .... পৃষ্ঠা - ৬২

A Disturbed World
Kornelius Hembram .... পৃষ্ঠা - ৬৮

কফিন বন্দী আমি
ড তপন বালা পৃষ্ঠা—৭০

সম্পাদকীয়

সম্পাদকীয়

প্রিয় পাঠকবৃন্দ,

সদা সক্রিয় ও সৃজনশীল একটি কলেজ পত্রিকার নতুন সংখ্যা প্রকাশের এই শুভক্ষণে আপনাদের সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। আমাদের প্রিয় কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম মহাবিদ্যালয়ের পত্রিকা "প্রত্যুষ" শুধু একটি পত্রিকা নয়; এটি আমাদের সকলের মিলিত প্রচেষ্টার এক উজ্জ্বল প্রতিফলন।

এই পত্রিকার প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি লাইন আমাদের কলেজের অধ্যক্ষ, শিক্ষক-শিক্ষিকা, ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষাকর্মী এবং লেখকদের সম্মিলিত প্রয়াসেরই ফল। তাদের অমূল্য সময়, নিরলস পরিশ্রম এবং সৃজনশীল ভাবনার জন্য আমি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ।

প্রথমেই আমাদের অধ্যক্ষ মহোদয়াকে ধন্যবাদ জানাই, যিনি সবসময় আমাদের প্রতিটি উদ্যোগে প্রেরণা জুগিয়েছেন এবং এই পত্রিকার সাফল্যের পেছনে একজন নির্ভরযোগ্য অভিভাবকের মতো পাশে থেকেছেন। পাশাপাশি পত্রিকার সম্পাদকীয় কমিটির প্রতিটি সদস্যকে ধন্যবাদ, যাঁরা দিন-রাত এক করে এই সংখ্যাটিকে সফল করতে প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন।

আমাদের লেখকরা—শিক্ষক, ছাত্রছাত্রী এবং প্রাক্তনীরা—তাঁদের মননশীল চিন্তা ও সৃজনশীল প্রতিভার মাধ্যমে এই সংখ্যাকে সমৃদ্ধ করেছেন। বিশেষ ধন্যবাদ জানাই আমাদের শিক্ষাকর্মীদের, যাঁরা পর্দার আড়ালে থেকে সব কাজকে সাবলীল করে তুলেছেন।

এবারের সংখ্যার বিশেষত্ব হলো, এটি আমাদের কলেজের সাম্প্রতিক সাফল্য এবং উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের একটি সার্থক প্রতিচ্ছবি। **ন্যাশনাল অ্যাসেসমেন্ট অ্যান্ড অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল** (NAAC)-এর মূল্যায়ন প্রক্রিয়া এবং তার প্রস্তুতি নিয়ে আমরা যে একতাবদ্ধভাবে কাজ করছি, তার কিছু ঝলক এখানে ধরা পড়েছে। কলেজ ক্যাম্পাসের শৃঙ্খলা, পরিবেশ, এবং শিক্ষার মানোন্নয়নে আমরা যে উদ্যোগ নিয়েছি, তা নিয়ে আমরা গর্বিত।

সৃষ্টিশীলতা ও একতার এই যাত্রা অব্যাহত থাকুক। "প্রত্যুষ"-এর এই সংখ্যাটি আপনাদের সবার হৃদয়ে জায়গা করে নেবে বলে আমার বিশ্বাস। আপনাদের মতামত ও পরামর্শ আমাদের ভবিষ্যৎ সংখ্যাগুলো আরও সমৃদ্ধ করতে সহায়তা করবে।

শুভেচ্ছান্তে,

সম্পাদক

"প্রত্যুষ"

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম মহাবিদ্যালয়

Scanned with OKEN Scanner

প্রিয় শিক্ষার্থী, সহকর্মী এবং পাঠকবৃন্দ,

আমাদের কলেজ কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম মহাবিদ্যালয়ের সাম্প্রতিক কর্মকাণ্ড এবং বহুমুখী সাফল্যের সাক্ষী হয়ে **"প্রত্যুষ"**-এর নতুন সংখ্যা প্রকাশিত হতে চলেছে, যা আমাদের কলেজের সামগ্রিক উন্নয়ন এবং একতা প্রদর্শনের এক অনন্য প্ল্যাটফর্ম।

এটি আমাদের জন্য অত্যন্ত গর্বের যে, **ন্যাশনাল অ্যাসেসমেন্ট অ্যান্ড অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল** (NAAC)-এর মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় আমরা প্রথমবারের মতো অংশগ্রহণ করতে চলেছি। এটি আমাদের কলেজের শিক্ষার মানোন্নয়ন এবং সামগ্রিক অগ্রগতির স্বীকৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। আমরা এই মূল্যায়নের জন্য সমস্ত প্রস্তুতি অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে সম্পন্ন করেছি।

কলেজের শৃঙ্খলা ও শিক্ষার মান উন্নত করতে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল:

- **লাইব্রেরি অটোমেশন: আমাদের পাঠাগারকে আধুনিক প্রযুক্তিতে সজ্জিত করা হয়েছে, যা শিক্ষার্থীদের জ্ঞান অর্জনের নতুন সুযোগ এনে দিয়েছে।**
- **সাইকেল স্ট্যান্ড নির্মাণ: পরিবেশবান্ধব উদ্যোগ হিসেবে নতুন সাইকেল স্ট্যান্ড স্থাপন করা হয়েছে।**
- **সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন: ক্যাম্পাসের নিরাপত্তা এবং শৃঙ্খলা নিশ্চিত করতে ক্যাম্পাসে সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো হয়েছে।**

আমাদের নিয়মিত বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি ক্যাম্পাসকে আরও সবুজ এবং পরিবেশবান্ধব করে তুলেছে। এর পাশাপাশি শিক্ষা, ক্রীড়া এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আমাদের শিক্ষার্থীদের অসাধারণ সাফল্য কলেজের গৌরব আরও বৃদ্ধি করেছে।

এই সাফল্যের যাত্রা একদিনে হয়নি। আমাদের প্রত্যেকের সম্মিলিত প্রচেষ্টা, অধ্যবসায় এবং কঠোর পরিশ্রম এর ভিত্তি। ন্যাকের মূল্যায়ন আমাদের সাফল্যকে নতুন মাত্রায় নিয়ে যাবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে আশাবাদী।

"প্রত্যুষ"-এর এই সংখ্যার মাধ্যমে কলেজের অগ্রগতির বার্তা সবার কাছে পৌঁছাবে এবং আমাদের ভবিষ্যৎকে আরও উজ্জ্বল করবে—এই প্রত্যাশা রাখি।

শুভকামনায়,

ডঃ মহামায়া লাহা মুখার্জী

অধ্যক্ষ, কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম মহাবিদ্যালয়

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

শুভেচ্ছাবার্তা

মহাবিদ্যালয়ের সাহিত্যপত্রিকা প্রত্যুষের পাঠকদের প্রতি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

আমাদের প্রিয় কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম মহাবিদ্যালয়ের কণ্ঠস্বর "প্রত্যুষ"-এর নতুন সংখ্যার প্রকাশের এ শুভ মুহূর্তে আমি গভীর আনন্দ অনুভব করছি। এটি শুধু একটি কলেজ পত্রিকা নয়; বরং এটি আমাদের অধ্যক্ষ, শিক্ষক-শিক্ষিকা, কর্মচারী, এবং ছাত্রছাত্রীদের একতা ও সৃষ্টিশীলতার প্রতীক। "প্রত্যুষ" আমাদের কলেজের গতিশীল কর্মকাণ্ড, সাফল্য এবং ভবিষ্যতের পথচলার দিকনির্দেশনার প্রতিফলন।

বর্তমানে আমাদের কলেজ **ন্যাশনাল অ্যাসেসমেন্ট অ্যান্ড অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল** (NAAC)-এর মূল্যায়নের প্রস্তুতিতে অগ্রসরমান। এটি শুধুমাত্র আমাদের কলেজের মানোন্নয়নেরই অংশ নয়; বরং এটি আমাদের স্বপ্ন, পরিশ্রম এবং একাগ্রতার উদাহরণ। নিয়মিত ক্লাস পরিচালনা, পরীক্ষা ও সহশিক্ষামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে আমরা শিক্ষার সর্বোচ্চ মান নিশ্চিত করার চেষ্টা করে যাচ্ছি।

এই "প্রত্যুষ" পত্রিকার পাতাগুলোতে শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল ভাবনা, নবীন দৃষ্টিভঙ্গি এবং নতুন উদ্ভাবন ধরা থাকবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। এটি শিক্ষার্থী, শিক্ষক, এবং সমগ্র কলেজ পরিবারকে আরও অনুপ্রাণিত করবে।

আমাদের অগ্রগতির এই যাত্রায়, কলেজের প্রত্যেক সদস্যের সহযোগিতা এবং অধ্যবসায়ই মূল চালিকাশক্তি। ভবিষ্যতে আমরা আরও বড় সাফল্য অর্জন করব এবং আমাদের প্রিয় কলেজকে আরও উজ্জ্বল পর্যায়ে পৌঁছে দেব—এই প্রত্যাশায় রইলাম।

শুভকামনায়,

শ্রী কৃষ্ণচন্দ্র সাঁতরা

সভাপতি

কলেজ পরিচালন সমিতি, কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম মহাবিদ্যালয়

Scanned with OKEN Scanner

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী : জীবন ও সাহিত্য :

ড. নন্দ কুমার পাখিড়া
অধ্যাপক
বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ

আবির্ভাব-কাল:

মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যাকাশে এক প্রতিভাবান জ্যোতিষ্ক হলেন কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী । কবি ষোড়শ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন।

কবি-জীবনী:

রামগতি ন্যায়রত্ন কবির প্রকৃত নাম মুকুন্দরাম বলে জানালেও সুকুমার সেন মহাশয় জানিয়েছেন কবির প্রকৃত নাম মুকুন্দ। কবিকঙ্কণ তাঁর উপাধি , মুকুন্দ তাঁর নাম এবং চক্রবর্তী তাঁর কৌলিক পদবী। কবি প্রদত্ত বংশলতিকা মতে, রাঢ়ীয় কয়ড়ি গাঁই এর ছোট তরফের সাধন গোত্রীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন তপন ওঝা। তাঁর পুত্র উমাপতি এবং উমাপতির পুত্র ছিলেন মাধব। মাধবের কনিষ্ঠ পুত্র হলেন জগন্নাথ। তাঁর পুত্র হলেন গুণীরাজ মিশ্র বা হৃদয় মিশ্র। হৃদয় মিশ্রের দুই সন্তান - কবিচন্দ্র ও মুকুন্দ। মুকুন্দের দুই পুত্র ও দুই কন্যা - শিবরাম ও মহেশ এবং যশোদা ও চিত্রলেখা। কবির মাতার নাম দৈবকী ।

দামিন্যা ছিল কবির নিবাস। (তবে কবির পূর্বপুরুষ মাধব ওঝার নিবাস ছিল কর্ণপুরে। দেবসেবার দায়িত্ব নিয়ে তিনি পরে দামিন্যায় বসবাস করেন।) দামিন্যার বর্তমান অবস্থান বর্ধমান জেলার রায়না থানায়। পুরুষানুক্রমে কবিরা দামিন্যার তালুকদার গোপীনাথ নন্দীর জমি ভোগ করতেন । পরে রাজনৈতিক ও সামাজিক সংকটে গোপীনাথের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হলে কবি তাঁর ভরসা ত্যাগ করে জীবিকার জন্য স্ত্রী-পুত্র-কন্যা সহ অন্যত্র পাড়ি দেন। জানা যায় , ডিহিদার মামুদ শরীফের অত্যাচারে কবি পরিবার সহ গ্রাম ত্যাগ করেন। তবে কবি দামিন্যা ত্যাগের সিদ্ধান্ত নেন চণ্ডীবাটি গ্রামের শ্রীমন্ত খাঁ ও মুনিব খাঁর পরামর্শে । পথে মামার বাড়ী তেউট্যায় পৌঁছে গঙ্গা দাসের সাহায্য পান এবং শেষ পর্যন্ত তৎকালীন অবিভক্ত মেদিনীপুরের আরড়া গ্রামে জমিদার বাঁকুড়া রায়ের আশ্রয় গ্রহণ করে তাঁর পুত্র রঘুনাথ রায়ের গৃহ শিক্ষক পদে কবি নিযুক্ত হন। সেখানেই কবি তাঁর 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যটি রচনা করেন । রঘুনাথ কবি কে ''কবিকঙ্কন" উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেন।

Scanned with OKEN Scanner

কাব্য রচনা কাল :

১৭৪৫ শকাব্দে (১৮২৩-১৮২৪ খ্রিস্টাব্দ) শ্রীযুক্ত রামজয় বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় কবি মুকুন্দের 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যটি (অভয়ামঙ্গল) সর্বপ্রথম মুদ্রিত হয় । গ্রন্থের শেষে কালজ্ঞাপক ছত্র অনুযায়ী কবির কাব্য রচনা কাল আনুমানিক ১৫৭৭ খ্রিস্টাব্দ । কালজ্ঞাপক ছত্রটি হলো -

"শাকে রস রস বেদ শশাঙ্ক গনিতা

কতদিনে দিলা গীত হরের বনিতা ।

অভয়ামঙ্গল গীত গাইল মুকুন্দ

আসোর সহিত মাতা হইবে সানন্দ ।।" (শকাব্দ ১৪৬৬)

আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন ১৫৭৭ খ্রিস্টাব্দ কে কবির দামিন্যা ত্যাগ ও কাব্য রচনার সময় বলে নির্ধারণ করেছেন । আচার্য সুকুমার সেন , শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় , আশুতোষ ভট্টাচার্য প্রমুখ গবেষকদের অনুমান ও বিভিন্ন তথ্য প্রমাণ থেকে জানা যায় কবি মুকুন্দ ১৫৮৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৬০৪ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে কাব্যটি রচনা করেছিলেন ।

কাব্য ও কবিত্ব :

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কাহিনী চার ভাগে বিন্যস্ত - বন্দনা অংশ , দেব খন্ড (শিব-সতী-পার্বতীর উপাখ্যান) , আখেটিক খন্ড (কালকেতু-ফুল্লরার উপাখ্যান), বনিক খণ্ড (ধনপতি-খুলনা-শ্রীপতির উপাখ্যান) । এই কাব্যের নায়ক হলেন ব্যাধ কালকেতু , নায়িকা তার স্ত্রী ফুল্লরা । কাব্যটি প্রায় সাড়ে পাঁচশ পদের সমষ্টি । সমস্ত মঙ্গলকাব্যের মতোই এর কাহিনীও দেব মাহাত্ম্যমূলক । স্বর্গের দেবী মর্ত্যে এসে কীভাবে তাঁর পূজা প্রচার করেন তার সবিস্তার বর্ণনা এই কাব্যে আছে। যে জীবন বোধ ও জীবনাভিজ্ঞতা থাকলে একজন কবি জীবনরস রসিক হতে পারেন , তার সবকিছুই কবির কাব্যে বিশেষভাবে লক্ষিত হয়। ঐতিহ্যকে গ্রহণ করে তাকে আত্মস্থ করে তার মধ্যেই নতুন সৃষ্টির ইঙ্গিত দানের মত মহৎ শিল্পীর কাজ কবি তাঁর কাব্যে করেছিলেন ।

মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্য ধারার 'চণ্ডীমঙ্গলে'র শ্রেষ্ঠ কবি নিঃসন্দেহে মুকুন্দরাম চক্রবর্তী। মঙ্গলকাব্যের প্রচলিত কাহিনীর মধ্যে তিনি মৌলিক সৃজনী শক্তি ও অভিনব কলা নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রেখে গেছেন । দেবতার মহিমা কাহিনী লিখতে বসে তিনি আমাদের চির পরিচিত এই লৌকিক সংসারে সুখ-দুঃখ , হাসি-কান্না বিজড়িত মানব-মানবীর জীবন চিত্রকেই পরম শ্রদ্ধা সহকারে পরিস্ফুট করেছেন।

Scanned with OKEN Scanner

অপরিমেয় মানব রসের শিল্প সৌকর্য সৃষ্টিতে ও মানবতার মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় কবি আধুনিক জীবন চেতনার সিংহদ্বারে এসে পৌঁছেছেন।

মুকুন্দরামের চন্ডীমঙ্গল কাব্যে 'অম্বিকামঙ্গল', 'গৌরীমঙ্গল' ও 'অভয়ামঙ্গল' নাম গুলি পাওয়া যায়। ত সাহিত্যের আলোচনায় 'অভয়ামঙ্গল' নামটি বেশি ব্যবহৃত হয়। কবি পূর্বের কাহিনীকেই নবতর রূপদান করে । তৎকালীন সমাজের প্রতি বাস্তব দৃষ্টি নিয়ে অসীম কৌতুহল ও শ্রদ্ধা সহকারে দারিদ্র লাঞ্ছিত মানুষের সুখ-দুঃখের জীবনযাত্রার নিখুঁত ছবি কবি এঁকেছেন। কবির উদার মনোভাবের জন্যই উচ্চ-নীচ, ভদ্র-অভদ্র, সাধু-হিন্দু-মুসলমান সকল শ্রেণীর চরিত্রের লীলারস তিনি নিরপেক্ষ সমাজ সচেতন শিল্পীর মতো উপলব্ধি করে ত চরিত্র চিত্রনেই প্রয়াসী হয়েছেন। ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের আরোপ ও জীবন রসের প্রাচুর্যে মুকুন্দরাম মধ্যযুগের মাটিতে দাঁড়িয়েও আধুনিক মানব ধর্মের প্রবক্তা । গ্রাম-বাংলার সমাজ ও সর্বশ্রেনীর মানুষ তাঁর কাব্যে ভিড় করে এ । নীচ জাতি থেকে শুরু করে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, শিক্ষক-শিক্ষার্থী, বৈদ্য, স্বর্ণকার, দরিদ্র ব্যাধ, ঠগ প্রভৃতি বিচিত্র ব্যাপক বাঙালি জীবনের রূপকার তিনি। কবির অঙ্কিত ধূর্ত বেনে মুরারি শীল, প্রবঞ্চক ভাঁড়ু দত্ত, স্বার্থপরায় দুর্বলা দাসী প্রভৃতি চরিত্র একান্তভাবে এই ধুলো মাটি সংসারের মানুষ। স্থূল বুদ্ধি, অশিক্ষিত ও অমার্জিত কি সরল মনের অধিকারী কাব্যের নায়ক কালকেতুর ব্যাধ সুলভ চরিত্রটি খুবই জীবন্ত। তার স্ত্রী ফুল্লরা যথার্থ পতিভক্তিপরায়না, কর্মঠ ও পরিশ্রমী ব্যাধ পত্নী। সে বুদ্ধিমতী ও বাকচাতুর্যে অতুলনীয় । মধ্যযুগের শ্রমজীবী নারীর সাধারণ বৈশিষ্ট্য নিয়ে ফুল্লরা ফুটে উঠেছে এ কাব্যে।

কবি প্রতিভার চূড়ান্ত রূপ উদঘাটিত হয়েছে করুন রস সৃষ্টিতে । মানব জীবনের দুঃখ-দুর্দশার কাহি তাঁর কাব্যে নিবিড় রস সৌকর্য তৈরি করেছে । তিনি দুঃখ বর্ণনার কবি । জীবনের প্রতি তাঁর কোন নেতিবা দৃষ্টিভঙ্গি নয়, ছিল স্নিগ্ধ প্রশান্ত মমত্ববোধ । ব্যঙ্গ বিদ্রুপ, তির্যক দৃষ্টিতে, স্মিত কৌতুকে তিনি জীবনের সমস্ত দুঃখ-বেদনা-হতাশার উর্ধ্বে আনন্দলোকে বিচরণ করেছেন। করুণ রসের সঙ্গে সঙ্গে রঙ্গব্যঙ্গ ও হাস্যরস সৃষ্টি মুকুন্দরাম মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে উজ্জ্বল আলোক স্তম্ভের মতো বিরাজমান । শিব-পার্বতীর বিবাহে, কালকেতুর ভোজনের তালিকায়, সর্বোপরি ভাঁড়ু দত্তের কাহিনী সৃষ্টিতে মুকুন্দরাম অনাবিল হাস্যরস উজাড় ক দিয়েছেন । কাব্যের সর্বত্রই রয়েছে এক প্রসন্ন মধুর সজীব জীবন চেতনা । ফুল্লরার বারোমাসের দুঃখ বর্ণন করতে গিয়ে কবি তাঁর কবি প্রতিভাকে সম্পূর্ণ উজাড় করে দিয়েছেন কালকেতু-ফুল্লরার দুঃখ দুর্দশার মধ্যে মধ্যযুগের মধ্যবিত্ত বাঙালির জীবন কথাই জীবন্ত হয়ে উঠেছে -

Scanned with OKEN Scanner

"মাংসের পসরা লইয়া ফিরি দ্বারে দ্বারে ।
কিছু খুদ কুঁড়া পাই উদর না ভরে ।।" অথবা
"দুঃখ করো অবধান দুঃখ করো অবধান ।
আমানি খাবার গর্ত দেখো বিদ্যমান।।"

মুকুন্দরামের ভাষা ও রচনারীতি পূর্বের কবিদের থেকে অনেক মার্জিত ও অলংকার সমৃদ্ধ । বর্ণনার প্রাঞ্জলতায়, উপমা ও চিত্রকল্প ব্যবহারে, লৌকিক আবহ সৃষ্টিতে তিনি যথেষ্ট শিল্প নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন । কবি সীমাবদ্ধ কালকে অতিক্রম করে চিরকালীন মানুষের জীবনধর্ম উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছেন । সামাজিক মানুষের সংঘাত বিক্ষুব্ধ জীবনের বাস্তব কাহিনী রূপায়ণে তিনি যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্রমন্ডিত চরিত্রগুলি তুলে ধরেছেন- তাতে তাঁর কবি প্রতিভা ঔপন্যাসিকের সমধর্মী হয়ে আধুনিক জীবন চেতনার সগোত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে ।

ছাত্রছাত্রীদের প্রাপ্তি

১) মহাবিদ্যালয়ের নতুন ক্লাসরুমের নির্মান

২) সাইকেল স্ট্যান্ড নির্মান

৩) কলেজ প্রাঙ্গনে সিসি টিভি

৪) অটোমেটেড লাইব্রেরী

৫) কলেজ লাইব্রেরীতে নতুন বইএর সংখ্যা বাড়ানো

৬) স্মার্ট ক্লাস রুম

৭) ফ্রী ওয়াইফাই

৮) মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষার মানউন্নয়ণ করা

৯) কম্পিউটারাইজড অফিস

১০) কলেজের ইউজিসি স্বীকৃতি

Scanned with OKEN Scanner

প্রকৃতি বাঁচাও: প্রকৃতি আমাদের বাঁচিয়ে রাখে

অমিত কুমার কুন্ডু, প্রাক্তন ছাত্র (২০১৭-২০২০)

কত ধর্মগুরু এলো, কত ধর্ম গুরু গেল অথচ কেউ বলে গেল না সে নরকে যাচ্ছে না স্বর্গে যাচ্ছে। মানুষ মাঝেমধ্যে টিভি সিরিয়ালের টি আর পি-র ঈশ্বরতত্ত্বের সাথে মিউজিয়ামগুলিতে থাকা সাক্ষ্যপ্রমাণ গুলির গুণ ভাগ করতে পারে।অস্ট্রালোপিথেকাস থেকে হোমো স্যাপিয়েন্স, নীলনদ থেকে সিন্ধু, ক্যাথলিক থেকে প্রোটেস্ট্যান্ট, ইহুদি থেকে ইসলাম, বৈদিক থেকে সনাতন কেউ গুরুর লাশ চিনতে পারেনি।

মানুষের ইতিহাস, ভারতের ইতিহাস, ধর্মের ইতিহাস এক নয়। সবকিছুই প্রয়োজনার্থে ঘটেছে অনুক্রমিক ভাবে। যেখানে যেমন ভাবে মানুষের বুদ্ধি বিকশিত হয়েছে সেখানে সেভাবেই মানুষ নিজের সংস্কৃতির বীজ বপন করেছে। মানুষের জন্মানো যেমন সত্য, মৃত্যুও তেমনি সত্য। মৃত্যুর পর ও জন্মের আগের সব ঘটনা কাল্পনিক গপ্পো । নাটক রচনা করতে হলে বাস্তবের সাথে কিছু কাল্পনিক ও অলৌকিক মালা গাঁথতে হয়। না হলে কেও ফুল কিনবে না। তা বলে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি বা নাম-জপ করা ভুল নয় যদি বাস্তবতা জানার পর করা হয়। ধর্ম একটা সংস্কৃতি। মানুষের বেঁচে থাকার একটা সতন্ত্র উপাদান। প্রকৃত ভাবে ঈশ্বর আরাধনার কোন নিয়ম নেই কোন মন্ত্র নেই। শুদ্ধ বিচার দ্বারা মনের শান্তি লাভই মানব জীবনের বেঁচে থাকার পরম স্বার্থকতা। নিজের দোষ, দুর্বলতা, আশা, হতাশা, আকস্মিক দুর্ঘটনা কে ঘন্ট করে যে ঈশ্বর শব্দটি উঠে এসেছে তা কি বাস্তবিক অর্থে ঈশ্বর? বাস্তবিক ভাবে ঈশ্বর হল প্রকৃতি, যার মধ্যে আমরা বেঁচে আছি। যার স্বরূপ হল প্রেম। শুধু মানুষ কেন তার মধ্যে অবস্থিত সকল জীব ও জড়বস্তুর প্রতি তার একই ব্যবহার। যার ভাষা প্রেম, ধর্ম প্রেম, কর্ম প্রেম। রাষ্ঠ হলেও সকলের প্রতি একই ব্যবহার, সে তুমি বামুনের বংশ হও বা মুচির, কিংবা খান-সেখ বা তেলি তার সংবিধানে সবাই সমান। অথচ তাঁর দয়ায় বেঁচে থাকা মানুষ জাতি বিশ্বব্যাপী প্রায় ১০হাজারটি ধর্মের জন্ম দিয়েছে। তার মধ্যে শতশত জাতি, সহস্রাধিক প্রথা, বর্ণের ভেদাভেদ, সাংস্কৃতিক দুরুত্ব ও ধংস লীলায় মেতে উঠেছে।

Scanned with OKEN Scanner

প্রকৃতির উপাদান ছাড়া আমরা একটা মিনিট বাঁচতে পারবো না। অথচ আমরা সবাই প্রকৃতি সম্পর্কে উদাসীন। কোন পুজো পাব্বন করতে বা জলসার অনুষ্ঠান পালন করতে আমরা উৎসাহ নিয়ে অপেক্ষা করি ঠিকই কিন্তু আমরা যেন ভুলে না যাই তরোয়াল হোক বা ত্রিশুল দুটোই প্রাণঘাতী। কিন্তু প্রকৃতি প্রাণ দায়ক, সুন্দর ও শাশ্বত। যার কোলে মাথা রেখে আমাদের হারিয়ে যেতে হবে। প্রকৃতিই আমাদের সাক্ষ্য ঈশ্বর, আল্লা, গড। রূপকথার দাঁতভাঙা উচ্চারণের ভিন্ন ধর্মীয় গ্রন্থের অযৌক্তিক অদৃশ্য ঈশ্বরের থেকে প্রেমময়ী হৃদয় নিয়ে দৃশ্যবান প্রকৃতির উপাসনা করা অনেক সুন্দর ও যৌক্তিক।

নিশিথে পথিক

নাম:- আব্দুল আজিম মল্লিক

পঞ্চম সেমেস্টার

রাতের আকাশে তারার মেলা,
চাঁদের আলোয় স্বপ্ন খেলা।
নীরব পাখি, ছায়ার তলে,
নিশি রাতে পথিক চলে।
দূরে কোথাও কুয়াশা ঘেরা,
কোথায় যেন রূপকথার বাসা।

পথিকের চোখে ঝিলমিল স্বপ্ন,
নিশির বাতাসে মৃদু সুর মধুর।
নদীর পাড়ে ছায়া নাচে,
স্রোতের শব্দে হৃদয় নাচে।
চলতে চলতে হারায় পথিক,
রাতের আঁধারে খুঁজে মুক্তি।

অজানা সেই পথে, একাকী হাঁটে,
স্বপ্নের ডানায় উড়ে চলে দূরে।
আঁধার পেরিয়ে আলো খোঁজে,
নিশিথে পথিক, তবু সে পথ হারায়
না কখনো।

Scanned with OKEN Scanner

অতৃপ্ত

পুষ্কর মুখার্জী
দ্বিতীয় সেমিস্টার

সেদিন ভুড়গুড়ো থেকে কাজ সেরে বাড়ি ফিরছিলাম। স্টেশনে পৌঁছাতে বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা নামলো। বর্ষার দিন, আকাশ ভেঙে যেন বৃষ্টি পড়ছে। স্টেশন প্রায় জনশূন্য। জামাকাপড় ভিজে শরীর কাঁপছে ঠান্ডায়। এমন সময় স্টেশনের মাইকে ঘোষণা শোনা গেল—পাশের স্টেশনের কাছে ভূমিধসের কারণে ট্রেন বাতিল করা হয়েছে। পরের ট্রেন কখন আসবে তা নিশ্চিত বলা গেল না; সম্ভবত রাতে।

ঘোষণা শুনে একরকম অসহায় আর বিরক্ত হয়ে পড়লাম। এমন অবস্থায় চোখ গেল স্টেশনের পশ্চিম প্রান্তে, এক কোনায়। দেখলাম, একটি মেয়ে একলা বসে গুমরে গুমরে কাঁদছে। দৃশ্যটা দেখে গা শিউরে উঠল। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর সাহস করে মেয়েটির দিকে ধীরে ধীরে এগোতে লাগলাম।

কাছে গিয়ে যা দেখলাম, তা দেখে বুকের রক্ত যেন জমে গেল। মেয়েটির কোনো মুখমণ্ডল নেই! একটি বিভৎস, ভয়ঙ্কর চেহারা। মুখের জায়গায় কেবল কালো শূন্যতা, আর কয়েকটি ছিন্নবিচ্ছিন্ন ত্বকের টুকরো যেন বাতাসে ভাসছে। তবুও সে মাথা নিচু করে কাঁদছে। এমন দৃশ্য দেখে বৃষ্টির আওয়াজ যেন মুহূর্তের জন্য থেমে গেল। আমি স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

হঠাৎ মেয়েটি কাঁদা থামিয়ে ধীরে বলে উঠল, "সৌমেন, তাই তো?"

আমি শিউরে উঠে জিজ্ঞেস করলাম, "তুমি কে? আর আমার নাম জানলে কী করে?"

Scanned with OKEN Scanner

সে এক অদ্ভুত হাসি হেসে বলল, "ঠিক বলেছ, আমি মানুষ নই। তবে একসময় ছিলাম। আমার নাম ছিল লীলাবতী। সবাই বলত, আমি আমাদের গ্রামের সবচেয়ে সুন্দরী। খুব অল্প বয়সে পাশের গ্রামের এক ছেলের প্রেমে পড়েছিলাম। সেও আমায় ভালোবাসত। কিন্তু আমার বাবা ছিলেন গরিব। তাই আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে গ্রামের হরিখুড়োর ছেলের সঙ্গে আমার বিয়ে ঠিক হয়।"

লীলাবতীর গলা ভারী হয়ে এল। সে বলতে লাগল, "বিয়ের পর থেকে আমার উপর অত্যাচার শুরু হয়। বাবা কিছু দিতে না পারার কারণে আমাকে প্রতিনিয়ত অপমান আর লাঞ্ছনা সইতে হতো। কয়েক বছর এভাবেই চলল। একদিন ওরা আমার মুখে ফুটন্ত গরম তেল ঢেলে দিল। মুহূর্তের মধ্যে আমার মুখ বিকৃত হয়ে গেল। যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে আমি মারা গেলাম।"

তারপর একটুখানি থেমে সে বলল, "ওরা আমার নিথর দেহটি এই স্টেশনের এক কোণে ফেলে দিয়ে চলে যায়। সেই থেকে আমি এই স্টেশনেই আটকে আছি—এক অতৃপ্ত আত্মা হয়ে।"

আমি নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। এমন সময় স্টেশনের মাইকে ঘোষণা হলো, "পরের ট্রেন আসছে।" চমকে পিছনে তাকালাম। কিন্তু লীলাবতী তখন আর সেখানে নেই। তার অস্তিত্ব মিলিয়ে গেছে। ট্রেন এসে থামল, বৃষ্টিও থেমে গেল। ট্রেনে উঠে শরীরটা একটু শান্তি পেল। কিন্তু একটা প্রশ্ন অমীমাংসিত রয়ে গেল—লীলাবতী কীভাবে আমার নাম জানল?

সমাজের প্রতি এক গভীর আক্রোশ আর লীলাবতির প্রতি অপরিসীম করুণা নিয়ে আমি বাড়ির পথে রওনা দিলাম।

Scanned with OKEN Scanner

পথভোলা এক পথিক

শিউলি রক্ষিত

অধ্যাপিকা, ইংরেজি বিভাগ

বরাবরই আমায় কর্মক্ষেত্রের তুলনায় কর্ম পথ বেশি আকর্ষণ করে। আজ তিন বছর হল চাকরি করছি। প্রত্যন্ত গ্রামে আমার রুজিরুটির ঠিকানা, আমার পরিমিত আত্মপ্রকাশ ও গম্ভীর পরিচয়, অতিথি অধ্যাপিকা। প্রথম দিন যখন কর্মক্ষেত্রের উদ্দেশ্যে রওনা হই, তখন একবার নির্ধারিত বাস ও আরেকবার অপ্রত্যাশিত অনির্ধারিত যান যে আমার জান কয়লা করার হুমকি দিয়েছিল তা অস্বীকার করার ধৃষ্টতা আমার নেই। তার যথার্থ কারণও আছে এবং তা আমার সহকর্মী সহযাত্রী বন্ধুগণ সাগ্রহে দিতে আগ্রহ প্রকাশ করবে আমি নিশ্চিত। তবুও প্রথম দিনের হুমকিকে ভীতু ভাড়াটের মতো হজম করতে করতে যখন ওই জান কয়লা করা যানে অর্থাৎ ম্যাজিক গাড়িতে উঠলাম তখন আমি ভগবানের দেওয়া প্রাণ ও সদ্য বিশ্ববিদ্যালয় ফেরত দমটা সামলাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছি। আর ঠিক এই সময় আমার "অমল ধবল পালে মন্দ মধুর হাওয়া" লাগল। বাইরে তাকিয়ে দেখি দুপাশে সবুজ আর সবুজ মাথার উপর সাদা ফুল ফুল মেঘময় নীল আকাশ, যেন একটা নকশী নীল ছাতা। গাড়ি কখন ব্যস্ত ট্রাফিক ছাড়িয়ে এসেছে সবুজে ঘেরা পথে। এতক্ষণে গাড়িটির নামে আমার আশ্চর্য কেটে আস্থা জন্মালো। মাথার উপর তুলোর মেঘ আর কিছুদূর অন্তরে অন্তরে কাশফুল দেখে বুঝলাম এ শরৎকাল। শিহরিত হলাম, মুগ্ধ না হয়েও উপায় ছিল না যে। দুপাশে বিশাল বিশাল ঘন সবুজ মহীরুহ আর কার্পেটের মতো মাঠের পর মাঠ বিছানো কচি ধান, আমার মন ছুঁয়ে থাকল পুরোটা পথ। গন্তব্যের কথা ভুলে মেরে দিলাম একেবারে। এই মুহূর্তে সম্মোহনই আমার একমাত্র গন্তব্য। তবে আশ্চর্য হলাম এটা ভেবে যে বাড়ি থেকে কতটুকুই বা দূরে এসেছি, বিশ-পঁচিশ কিলোমিটার হবে। বলতে গেলে আমিও তো তেমন কোন বিশাল বা কেউকেটা শহরের মানুষ নই, মফস্বলের মেয়ে। তবে আমার শহরে যে ঋতু আছে সে

শরৎ নয়? নাকি আমি দিবাস্বপ্নে বিভোর হয়ে প্রকৃতির অবিচারের বিচার করার বৃথা চেষ্টা করছি। মাত্র ঢিল ছোড়া দূরত্বের দুটি জায়গার প্রকৃতির মধ্যে এমন রঙিন বেরঙিনের তারতম্য আমাকে মগজভর্তি বিস্ময় এনে দিল। আমি তাতে বিলি কাটতে কাটতে এক একটা বাঁক পেরতে লাগলাম। কখনো ঘন সবুজ, কোথাও আবার শুধুই সাদা কাশ, যেন মেঘগুলো উপচে পড়ছে টাল সামলাতে না পেরে। রেলগেটের দু'ধারে তাদের অবিশ্বাস্য বেয়ারা বারণ আমাকে অপু দুর্গার কথা মনে করিয়ে দিল। এমন সময় খেয়াল হলো গাড়ি থেমেছে। গ্রাম্য ভাষায় বাকবিতণ্ডা করে দুজন ভদ্রমহিলা ভাড়া মিটিয়ে ওই সবুজে ঘেরা মাঠে নেমে গেলেন মালপত্র সমেত। আমার কৌতূহলী চোখ ওদের পিছু নিল কিছুক্ষণ। সরু আলের রাস্তা ধরে ওদের সবুজের মধ্যে মিশে যাওয়া দেখতে দেখতে আমি এগিয়ে যেতে লাগলাম। অনেক পরে বিশেষত যাতায়াতেই শুনেছি এবং লক্ষ্য করেছি, শীতের সময় যখন মাঠ ফাঁকা থাকে, ওই মাঠের পরে একটি ছোট খাল আছে। আর খাল পেরোলেই দশ বারোটা ঘর নিয়ে ছোট্ট একটা গ্রাম মায়ের মতো আঁচল বিছিয়ে বসেছে। দূর থেকেই দেখেছি শীতের সময় ওদের মাঠের উপর রোদ মাখামাখি। চারপাশে গাছে ঘেরা আলোছায়া একটা পল্লী। ঠিক যেন স্বার্থপর দৈত্যের প্রবেশ নিষিদ্ধ অপূর্ব বাগান। এ তো রইলো রেলগেটের ওপারের কথা। এপারের রূপ আমাকে যে আরো আশ্চর্য করবে তা আমি আগেই বুঝেছি। একটার পর একটা গ্রাম পেরোতে লাগলো। আর সবুজ শাশ্বত সারল্যের মধ্যে প্রবেশ করতে লাগলাম। প্রবেশেই প্রথম চোখে পড়ল একটা নাম না জানা গাছ, তার পাতার মধ্যে কোঁকড়ানো হলুদ ফুল কানের ঝুমকোর মতো দুলিয়ে চলেছে আর ঠিক তার পাশে টকটকে অভিমান নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটা গাঢ় গোলাপী রঙের বোগেনভেলিয়া। আমার মনের মানচিত্রে সঙ্গে সঙ্গে ওর একটা পাকাপাকি জায়গা করে দিলাম। তারপর থেকে যতবার ওই রাস্তায় গেছি তাকে কুর্নিশ না জানিয়ে যাইনি একটি বারও। এবার একটা ছোট্ট গ্রাম্য বাজার পেরিয়ে পড়লাম আমার গন্তব্যের সড়কে। দুপাশে যতদূর চোখ যায় শুধু সবুজ ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না। এ রাস্তা যেন শুধুই তারুণ্যে ভরা। সবুজ মাঠগুলোকে অতন্দ্র প্রহরীর মত পাহারা দিচ্ছে কয়েকটা লাল শিমুল আর কৃষ্ণচূড়া। তাদের পরিচয় সারা বছর গোপনেই থাকে পথিকের কাছে। কেবল

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

বসন্তে তারা অন্তরে বাহিরে এমন রঙিন হয়ে ওঠে যে পথিকের পথ ভোলা ছাড়া গতি থাকে না। রাস্তার দু'ধারে এলোপাথারি ফুল ছড়িয়ে বসন্তের আনন্দে রঙিন হয়ে থাকে তারা। এই অকৃতি অধমের মনে তাদের অকৃত্রিম বর্ণাঢ্য শোভা যে নতুন তুলিতে ওদের জন্য ভালোবাসা আঁকবে তা বলাই বাহুল্য। ভালোবাসার কোন জন্ম মৃত্যু নেই। এ এক সনাতন প্রাকৃতিক স্বাদ। প্রথম দিনই মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকা দুটো লাল শিমুলের প্রেমে পড়ে গিয়েছি। যাকে বলে প্রথম দর্শনেই প্রেম। এরপরই আমার গাড়ি থামল। আমি আকণ্ঠ ভালোবাসায় বুঁদ হয়ে নামলাম আমার কুরুক্ষেত্রে। তারপর থেকে সাতটা বছর কেটে গেছে। ঋতুর পরিবর্তন দেখেছি এই স্বর্গছেঁড়া গ্রামগুলিতে। আর যা দেখেছি তা ভীষণ কষ্টের এবং যন্ত্রণার। যত দিন গেছে ততো সবুজের উপর কোপ পড়েছে। কি ভীষণ দ্রুত গতিতে চারপাশ ভরে উঠেছে এশিয়ান পেন্টস, বার্জারের চোখ ঝলসানো রঙে। নিয়মমাফিক রাস্তার উপর মৃতদেহের মতো পড়ে থাকছে আশি কিংবা নব্বই বছরের বলিষ্ঠ যুবকদেহী সব মহীরুহ। সড়ক দীর্ঘ হবে। যানবাহন বাড়বে, ট্রাফিক বাড়বে। খুব দ্রুত পৌঁছানো যাবে ঠিকানায়। শুধু এই রাস্তায় আর কখনো কোন পথিক পথ ভুল করবে না।

আমার স্বপ্ন

সুপ্রিয়া পোড়েল, ২য় সেমেস্টার

জন্ম হলো গরিব ঘরে,
পথের ধারে বাস,
গরিব ঘরে স্বপ্ন আমার—
ছোঁব যে আকাশ।
স্বপ্ন আমার এতই কঠিন,
ঘুম আসে না মোটে;

খাতার পাতায় ভেসে বেড়ায়
শুধুই চোখের দেশে।
চোখের তারায় মনের মাঝে
স্বপ্ন যখন আসে,
মনে পড়ে গরিব ঘরের
স্বপ্ন যাবে ভেসে।

Scanned with OKEN Scanner

বিশ্বায়নের যুগে মাতৃভাষার গুরুত্ব

সুবীর পণ্ডিত

ষষ্ঠ সেমিস্টার

আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি,
আমি কী ভুলিতে পারি?
ছেলে হারা শত মায়ের অশ্রু গড়িয়ে যায়—
এই ফেব্রুয়ারি, আমি কী ভুলিতে পারি?
আমার সোনার দেশের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি,
আমি কী ভুলিতে পারি?

মহান একুশে ফেব্রুয়ারি, আজ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। 1952 সালের এই দিনে, সমগ্র বিশ্বকে অবাক করে দিয়ে, মায়ের ভাষার জন্য বুকের রক্ত ঢেলে দিয়েছিলেন বাংলাদেশের সূর্যসন্তানরা। তাদের এই মহান আত্মত্যাগের জন্যই আজ আমরা পেয়েছি প্রাণের ভাষা, মায়ের ভাষা, অনুভূতির ভাষা—বাংলা। তাই একুশ আমাদের চেতনায়, একুশ আমাদের প্রেরণায়, আর একুশ আমাদের আত্মপরিচয়ের ভিত্তি। কবির ভাষায়—

*"একুশ আমার ব্যথায় কাতর চোখের বারিধারা,
একুশ আমার শূন্য হিয়ায় আকাশ ভরা তারা।
একুশ আমার রক্ত রাঙা কৃষ্ণচূড়ার ডাল,
একুশ আমার ঝাঁঝরা হওয়া জীর্ণ ঘরের চাল।"*

Scanned with OKEN Scanner

বাংলাদেশই একমাত্র দেশ, যেখানে মাতৃভাষার জন্য মানুষ প্রাণ দিয়েছে। 1947 সালের 14 আগস্ট পাকিস্তান স্বাধীন হওয়ার পর থেকেই তাদের সরকার উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার উদ্যোগ নেয়। এর প্রেক্ষিতে 1948 সালের 11 মার্চ পূর্ব বাংলায় প্রথম ভাষার দাবিতে বিক্ষোভ প্রদর্শিত হয়, যেখানে শেখ মুজিবুর রহমানসহ অনেকে গ্রেফতার হন।

21 মার্চ 1948 সালে পাকিস্তানের গভর্নর ঘোষণা করেন, উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। সেই সঙ্গে ঘোষণা দেওয়া হয় যে পাকিস্তানের শিক্ষার মাধ্যমও হবে উর্দু। এর ফলে পূর্ব বাংলার মানুষ তাদের মাতৃভাষার জন্য প্রতিবাদে ফেটে পড়ে।

পাকিস্তান সরকার 1952 সালের 20 ফেব্রুয়ারি ঢাকায় 144 ধারা জারি করে। কিন্তু 21 ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় ছাত্ররা সমবেত হয়ে মিছিল করে। পুলিশের গুলিতে শহীদ হন সালাম, রফিক, জব্বার, বরকতসহ আরও অনেক তাজা প্রাণ।

এই আত্মত্যাগকে স্মরণ করে মাওলানা ভাসানির নেতৃত্বে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা পরিষদ সিদ্ধান্ত নেয় 21 ফেব্রুয়ারিকে ভাষা দিবস হিসেবে পালন করা হবে।

বাংলাদেশের কানাডা প্রবাসী বাঙালিদের সংগঠন *"Mother Language Lovers of the World"* মাতৃভাষা দিবসকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি দেওয়ার উদ্যোগ নেয়। জাতিসংঘের পরামর্শে তারা বাংলাদেশের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাছে আবেদন করে। পরবর্তীতে UNESCO-র কাছে এই প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়। 1999 সালের 17 নভেম্বর UNESCO-এর 31তম সম্মেলনে 21 ফেব্রুয়ারিকে "আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস" হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। বর্তমানে বিশ্বের 188টি দেশে এই দিনটি পালিত হয়।

Scanned with OKEN Scanner

প্রতি বছর 21 ফেব্রুয়ারি আমরা ভাষাশহীদদের স্মরণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করি। তাদের আত্মত্যাগ আমাদের গর্বিত করেছে। মাতৃভাষার জন্য জীবন দেওয়া বাঙালি জাতি আজ সারা বিশ্বের কাছে সম্মানজনক স্থানে অধিষ্ঠিত। বাংলা ভাষা আজ শুধু একটি ভাষা নয়, এটি আমাদের অস্তিত্ব, আমাদের গর্ব।

আমাদের দায়িত্ব এই ভাষার মর্যাদা রক্ষা করা এবং একে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে সঠিকভাবে তুলে ধরা। একুশের চেতনা বেঁচে থাকুক চিরকাল।

আমি মানুষ

কাজী সাবানা আজমি

দ্বিতীয় সেমিস্টার

মানুষ আমি,
আমি এক আবেগ-প্রবল
হাওয়া।
আমি কে?
আমি এক মানুষ,
যার নেই কোনো ঠিকানা।
আমি চঞ্চল,
নিষ্ঠুর হৃদয়ে একা।
যে শুধু বেদনা দিয়ে যায়,
ফিরে চায় না কোনো প্রতিদান।

আমি হঠাৎ
সমুদ্রের পারে ভেসে আসা ঢেউ,
যা এক পলকে নিঃশেষ হয়,
তারপর আর থাকে না কেউ।
আমি কে?
আমি এক মানুষ,
যেন এক গিরগিটি,

পদে পদে রং বদলাই।
আমি এক মানুষ,
যার চিন্তায় নেই স্থিরতার
ঠাঁই।
আমি এক মুখোশধারী
মানুষ,
যার অন্তরে রয়েছে প্রবল
দ্বন্দ্ব।

Scanned with OKEN Scanner

আরামবাগের কর্মভূমি ও প্রফুল্লচন্দ্র সেন

আব্দুল জামান নাসের
অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

প্রফুল্লচন্দ্র সেন ছিলেন একজন বিশিষ্ট বাঙালি রাজনীতিবিদ, স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং সমাজসেবক। কলকাতার স্কটিশ চার্চ কলেজের মেধাবী ছাত্র প্রফুল্লচন্দ্র পদার্থবিদ্যায় স্নাতক হন। স্নাতকোত্তর পড়াশোনার ইচ্ছায় ইংল্যান্ডে অ্যাকাউন্টিং ফার্মে কাজের পরিকল্পনা থাকলেও, তা বাস্তবায়িত হয়নি।

১৯২০ সালে মহাত্মা গান্ধীর বক্তৃতা শুনে তিনি ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণের জন্য উদ্বুদ্ধ হন। ১৯২৩ সালে আরামবাগে এসে স্বদেশী কর্মকাণ্ডে আত্মনিয়োগ করেন। শিক্ষকতা শুরু করেন হুগলির বিদ্যামন্দিরে। মহাত্মা গান্ধীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে গ্রামে গ্রামে চরকা ও খদ্দর প্রচারে উদ্যোগী হন। দুর্গম ও ম্যালেরিয়া-প্রবণ অঞ্চল আরামবাগকেই তিনি কর্মভূমি হিসেবে বেছে নেন এবং দীর্ঘ যাট বছর সেখানেই কাটান। এই ত্যাগ ও সেবামূলক কর্মকাণ্ডের জন্য তিনি পরিচিত হন "আরামবাগের গান্ধী" নামে।

প্রফুল্লচন্দ্র সেন স্বাধীনতা সংগ্রামে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। কেশবপুর গ্রামের শিরীষ ঘোষ এবং পারুলের জমিদার তীর্থপতি রায়ের মতো মানুষ তাঁর দেশপ্রেমের কর্মযজ্ঞে পাশে ছিলেন। তিলক স্বরাজ তহবিলে অর্থ সংগ্রহের জন্য তিনি গ্রামে গ্রামে স্বদেশি গান গেয়ে প্রচার চালান।

স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁর ভূমিকার জন্য প্রফুল্লচন্দ্র সেন পাঁচ দফায় প্রায় নয় বছর কারাবাস করেন। কারাবাসে তৃতীয় শ্রেণির বন্দি হিসাবে থাকাকালীন একবার অসুস্থ হলে ভোঁতা ছুরি দিয়ে তাঁর অস্ত্রোপচার চালানো হয়, যা স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর ত্যাগের এক নির্মম উদাহরণ।

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

স্বাধীন ভারতে তিনি পশ্চিমবঙ্গের তৃতীয় মুখ্যমন্ত্রী হন এবং রাজনীতির পাশাপাশি সমাজসেবামূলক কাজেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। আরামবাগের উন্নয়নে তাঁর অবদান অসামান্য। সাগরলালের স্মৃতিতে তিনি দ্বারকেশ্বর নদের তীরে নির্মাণ করেন "সাগর কুটির," যা বিপ্লবীদের আশ্রয়স্থল এবং ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

আরামবাগের রেল স্টেশন এবং মেডিকেল কলেজ তাঁর নামেই প্রতিষ্ঠিত। তাঁর কর্মময় জীবন ও ত্যাগ বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য অনুপ্রেরণা। প্রফুল্লচন্দ্র সেনের স্মৃতি এবং আদর্শ চিরকাল বাঙালি জাতির হৃদয়ে অক্ষয় হয়ে থাকবে।

মায়া

কৌশিক ঘোষ

দ্বিতীয় সেমেস্টার

কোথায় কভু কেউ নেই
আছে শুধু মায়া
মায়ার জগত ছিন্ন করে
আঁকড়ে ধরো ছায়া
ছায়া কেবল ছলনাবিহীন
বাকি সবই ভ্রম

ধ্রুব সত্য জেনেও ফের
ভ্রমের পিছু মন; ভ্রম
ভ্রম ভ্রম করে শেষে
ভ্রমে দেয় ধোঁকা
অন্তিমে জ্ঞাতের পরে
চতুর্দিকে ফাঁকা

Scanned with OKEN Scanner

কল্পতরু

শম্পা মালিক

দ্বিতীয় সেমেস্টার

তুমি কি আদৌ আছো কল্পতরু?

হয়তো আছো, কিংবা নেই, কোনো কালেই ছিলে না!

থাকলে নিশ্চয় ধর্ম বিচার করে

কারো উপকার করতে না!

প্রত্যেক জীবের সমস্ত মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করতে!

তুমি কোথায় আছো? কল্পতরু?

ক্রন্দনরত আমি, যদি একবার তোমার কাছে
যেতে পারতাম,

যদি একবার তোমার কাছে যেতে পারতাম,

কোনো ধর্ম নিয়ে নয়,

একজন প্রকৃত মানুষ হয়ে যেতাম,

বলতাম তোমায় সমস্ত কথা

ভালোবাসতাম একটু,

নালিশ করতাম অনেকখানি।
তোমার তো উৎপত্তি হয়েছিল
সমুদ্র মন্থনে কামধেনুর সঙ্গে
স্বর্গে তুমি কেন গেলে
দেবরাজ ইন্দ্রের সাথে?

নালিশ আছে... কল্পতরু, নালিশ আছে...

তবে কি তুমি রাজা, মহারাজাদের কথা শুনে
চলো?

নাকি আমরাই বড়ো অবুঝ—

একটুতে খুশি হতে পারি না,

অভিমান, অভিযোগ, নালিশ করি তোমার
প্রতি।

কল্পতরু, শুধু রাজা মহারাজাদের কথা শুনলে, হবে-

দরিদ্র গরিব নিকৃষ্ট প্রজাদের কথা শুনো,

না হলে তোমার পতন হবে।

নালিশ আছে... কল্পতরুর, নালিশ আছে...

তবে কি তুমি রাজা মহারাজাদের কথা শুনে চলো

তাহলে তোমারও বিচার হবে,

তোমার দেবতার কাছে

যাইহোক কল্পতরু, তুমি আছ

প্রত্যেক জীবের মনের মনিকোঠায়

Scanned with OKEN Scanner

স্বপ্ন মৃত্যুহীন

সহেলী দাশ
পঞ্চম সেমেস্টার

একটি ছোটো গ্রামে একটি মেয়ে ছিল। মেয়েটি ছিল পরিবারের আদরের, বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান। সে ছিল খুবই মিষ্টি, সবসময় পরিবারের কাছে ছিল তার মন। মধ্যবিত্ত পরিবারের এই মেয়ে অনেক বড় স্বপ্ন দেখত। স্বপ্ন দেখতে সবাই ভালোবাসে, কিন্তু সেই স্বপ্ন পূরণ করতে যাওয়া খুব সহজ নয়। সবার মধ্যে সেই অদম্য ইচ্ছা ও জেদ থাকে না। অনেকেই বাধার সম্মুখীন হয়ে তাদের স্বপ্ন ত্যাগ করে দেন।

তবে এই মেয়েটির ক্ষেত্রে কোনো বাধাই তার স্বপ্নকে দাবিয়ে রাখতে পারেনি। ছোটো থেকেই তার একটি বড় স্বপ্ন ছিল - সে উচ্চাশী কর্পোরেট কাজকর্মে প্রবেশ করবে, বিশাল কোম্পানিতে কাজ করবে এবং সেই মাধ্যমে সমাজের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। তার মধ্যে মানবিক এবং অধিকার-পরিচালিত মূল্যবোধ ছিল, যা তাকে এই পথে চলতে অনুপ্রাণিত করেছিল। ছোটোবেলা থেকেই সে ছিল সহানুভূতিশীল, স্নেহশীলা, এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহসী।

বয়স বাড়ার সাথে সাথে এই স্বপ্ন আরও দৃঢ় হয়ে ওঠে। স্কুলে ভালো ফলাফল অর্জনের পর সে যোগ দেয় একটি নাম করা কলেজে, বিষয় ছিল বিজনেস ম্যানেজমেন্ট। সেখানে পড়াশুনা করতে গিয়ে সে ব্যবসায়িক জগতের বিষয়গুলি শিখতে থাকে, কর্পোরেট হাউসের প্রতি তার আগ্রহ ও কাজের আকর্ষণ উঁচুতে উঠতে শুরু করে।

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকে অসাধারণ ফলাফলের পর সে একটি প্রফেশনাল ম্যানেজমেন্ট ডিগ্রি অর্জন করে। তার বাবাও এই সাফল্যে গর্বিত ছিল।

কলকাতার একটি নামী মাল্টিনেশনাল কোম্পানিতে ম্যানেজারের পদে যোগ দেয় সে। সেখানে সে অত্যন্ত কঠোরভাবে কাজ করতে শুরু করে, ব্যস্ত দিনগুলোয় যে স্বপ্ন তার মনে ছিল তা বাস্তবায়নের জন্য। বেশ কিছু মাস চলে যায়, সবকিছু বেশ ভালোই চলছিল। তবে হঠাৎ একদিন, মেয়েটি একটি বেআইনি কার্যকলাপের বিষয়ে জানতে পারে। কোম্পানির অভ্যন্তরে কিছু দুর্নীতির চিত্র তার সামনে উন্মোচিত হতে থাকে।

সে গোপনে এই বিষয়গুলো নিয়ে তদন্ত করতে শুরু করে। কিন্তু যতই সে সত্যের পথ অনুসরণ করতে যায়, ততই তার ওপর চাপ সৃষ্টি হতে থাকে। এই অবস্থায় মেয়েটি যখন তার findings প্রকাশ করার চেষ্টা করে, তখন কর্পোরেট হাউসের কর্তৃপক্ষ ও দুর্নীতির সাথে জড়িত ব্যক্তিরা তাকে ভয় দেখায়। একদিন, বাধ্য হয়ে তাকে চুপ থাকতে বাধ্য করা হয়।

তারপর, সেই রাতেই, মেয়েটিকে অচেতন অবস্থায় পাওয়া যায়। কয়েকদিন পর, শহরের নির্জন প্রান্তে তার মৃতদেহ উদ্ধার হয়।

এটা কি জানো? সেই মেয়েটি কে ছিল? সে ছিল আমি। একদিন আমার স্বপ্ন ছিল, আমি ছিলাম সাহসী, ন্যায়নিষ্ঠ, একটি কল্যাণকর বিশ্বের জন্য লড়াই করতে প্রস্তুত। তবে কিছু দুর্নীতির কাছে আমার স্বপ্ন, আমার লক্ষ্য, সব কিছু চুরমার হয়ে গেল। কর্পোরেটের সেই খারাপ মানুষগুলির শাস্তি কী হয়েছে জানো? তারা আজ জেলে বন্দী। আর আমি, আমার আত্মা আজও এই নির্মম সত্যের সাক্ষী হয়ে আছি। শুধু বিচারের অপেক্ষায়।

নবনীতার পরিণয়

নিতাই চন্দ্র মন্ডল

অধ্যাপক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ

সময়টা ১৯৯৮ সাল। রমেনবাবু অধ্যাপণা করেন ভারতচন্দ্র রায় মহাবিদ্যালয়ে। সাম্মানিক বাংলা বিভাগের এক ঝাঁক উজ্জ্বল ছেলেমেয়ে তার স্মৃতিভান্ডারে একটি উপলব্ধীর জন্ম দেয়। ওই উপলব্ধীটিই একীভূত হয়ে অভিজ্ঞতার ফসল হয়ে ফলদান করে।

ফলটি হল নবনীতা ও নরেন দুই প্রিয় ছাত্রছাত্রী সদ্য উচ্চমাধ্যমিক পাশ করে মহাবিদ্যালয়ে অনুপ্রবেশ করেছে। চোখে মুখে প্রতিভার উজ্জ্বল দীপ্তি। এদেরকে ঘিরে আরো এক ঝাঁক উজ্জ্বল প্রতিভাধর ছেলে মেয়ের ঐক্যবদ্ধ উপস্থিতি। তারিফযোগ্য ছাত্রছাত্রীর পড়াশোনার ঝোঁক এবং ছাত্র শিক্ষকের সম্পর্কের মূল্যবোধ, শিক্ষার্থীদের শিক্ষানবিশী মানসিকতা বা ঝোঁক ছিল অপরিশীম। তারা ছোট ছোট বিভাগ করে নানা আলোচনার আসর বসাতো এবং কখনো কখনো সেই আসরে রমেন বাবু ও অন্যান্য সহকর্মী যুক্ত হোত। মহাবিদ্যালয়ের পরিসরে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান থেকে শুরু করে ক্রীড়া অনুষ্ঠান নবনীতা ও নরেন ছিল শিরোমনি। তবে মহাবিদ্যালয়ের অন্যান্য ছেলে মেয়েরা এবং অন্য বিভাগীয় ছেলেমেয়েরাও অংশগ্রহণে কোন অংশে কম যেতো না।

তবে নবনীতা ও নরেন এর ভূমিকা ছিল ঈর্ষনীয়। কারন এদের কে ঘিরে মহাবিদ্যালয়ের অন্যান্য ছেলে মেয়েরাদের আকর্ষণ ছিল চোখে পড়ার মতো।

এই দুই ছাত্রছাত্রীর কথোপকথনকে প্রথমে মনে হত অপরিচিতের পরিচিতি দান, প্রথমে অন্যান্য ছেলে মেয়েরা এটাই মনে করতো, আর মনে করাটাই ছিল স্বাভাবিক, প্রথম বর্ষের অভিজ্ঞতায় এটাই ছিল পরিচিত রুপ। অন্যান্য ছেলে মেয়েদের নজর ছিল নবনীতা ও নরেনের প্রতি। প্রথম বর্ষের ফলাফল ছিল ঈর্ষনীয়। এদের দু জন ছেলে মেয়ের সম্পর্কে কিছু ছেলে মেয়ের ।

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

আপত্তিকর অভিযোগও ছিল। কিন্তু ওটা অন্যান্যদের অপারগতার পরিণাম। এই ভাবেই নবনীতা ও নরেনের বন্ধু ক্রমশ সহপাঠীর গন্ডি ছাড়িয়ে ব্যক্তিগত সম্পর্কের ভালো-মন্দের অংশীদারিত্বে পৌছায়। কিন্তু শালীনতার বাঁধনে সম্পর্কের মূল্যবোধকে আইনের শাসনে বাঁধা সম্পর্কের অপমৃত্যু। তাই কেউ আপত্তি জানাতে গেলেও সচেতনার ভাবমন্ডলে থমকে দাঁড়ায়।

নবনীতা ও নরেন এমনি করেই দ্বিতীয় বর্ষে উত্তীর্ণ হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় দু-জনেই নজরকাড়া ফলাফল করে। এই কারনে অন্যান্য সহপাঠীরা তাদের প্রতি যে অভিযোগ আনে সেটা আর মান্যতা পায়নি। ফলত মহাবিদ্যালয়ের অন্যান্য ছেলেমেয়েদের আকর্ষণ ও নজর দুই বেড়ে যায়। আবার অন্যদিকে বেশ কিছু ছেলে মেয়ে সত্যটাকে মেনে নিয়ে তাদের সঙ্গে বন্ধুত্বের মাত্রকে বাড়িয়ে দেয়। নবনীতা ও নরেন দুজনে সম্পর্কের পরিসরকে বন্ধুত্বের থেকে ব্যক্তিকেন্দ্রীক স্তরে নিয়ে যায় এবং দুজন একে অপরের সাক্ষাতের সময় খোঁজে। সাক্ষাতগুলো এখন নিভৃতে এবং নিরালার অবস্থান খোঁজে, দুজনের মধ্যে কথাবার্তার এখন অনেক সংক্ষিপ্ত এবং ব্যঞ্জনাগর্ভ, একদিন নরেন ও নবনীতা একই বাসে কলেজ স্ট্যাণ্ডে নেমে হটাৎ বলে ওঠে 'বেলা বারোটা"। অন্যান্য সহপাঠীরা বুঝে ওঠার আগেই মুখ চাওয়া চাওয়ি করে। কিন্তু দর্শক ও পাঠক এর ভাবনা ও আকর্ষণ অনেক গুন বেড়ে যায়। এখন নবনীতা ও নরেন একে অপরের কাছে অপরিহার্য যে, দুজনের পরিবারের আত্মীয় পরিজনদের থেকে নিজেদেরকে আপনজন ভাবে। এখন এদের মনে বৈষ্ণব কবিতার অভিব্যক্তি।

'ঘর কৈনু বাহির; বাহির কৈনু ঘর। পর কৈনু আপন আপন কৈনু পর"

মহাবিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েদের মধ্যে নূতন ও পুরাতন উভয়দের মধ্যেই একটা গভীর উৎসুক্য

এমনি করে তৃতীয় বর্ষে উন্নীত হয় নরেন ও নবণীতা। এখীন তারা অনেক সাবালক এবং কলেজের দাদা দিদিও বটে। তারা যেমন অন্যদের শাসন করে আবার অত্যন্ত স্নেহ ভালবাসাও দান করে। কিন্তু নিজেদের অবস্থানটিকে ব্যক্তি সম্পর্কের স্তরে তুলে নিয়ে যায়। ভবিষ্যতে তারা দুজনে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হবার প্রতিশ্রুতি দেয়। আবেগের মূহূর্তে কল্পনার ফানুস উড়িয়ে দুজনের জীবনকে সোনায় ভরিয়ে তোলার আশ্বাস দান করে। কিন্তু আবেগ ও কল্পনা একরকম আর বাস্তব কঠিন ও কঠোর।

Scanned with OKEN Scanner

এই তিন বছরের সম্পর্কের সমস্ত সঞ্চয় ও প্রতিশ্রুতি যেন মুখ থুবড়ে পড়ে তৃতীয় বর্ষের বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলাফল বের হবার পর। ফলাফলে দেখা যায় নবনীতা বাংলা সাম্মানিক স্নাতকে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়। দুর্ভাগ্যবশত নরেন দুটি পত্রে ফেল করে অনত্তীর্ন হয়। নবনীতের মন খারাপ ততোধিক মনখারাপ নরেনের।

এতদিনে দুজনের পরিবারের অভিভাবক ও পরিজনদের মধ্যে বিষয়টি জানা জানি হতে বাকি থাকেনা। এরই প্রেক্ষীতে নবনীতার বাবা রমেশ বাবু মেয়ের পাত্র খোজার জন্য উঠে পড়ে লাগেন। বিষয়টি নবনীতা জানার পর বাধ সাধে, কিন্তু তার আপত্তি ধোপে টেকে না। অবশেষে ব্যাঙ্কে রমেশ বাবু পাত্রের সন্ধান পায়, পাত্র অনিরুদ্ধ, পেশায় ব্যঙ্ক কর্মচারী। শেষে দেখা যায়, নবনীতা অনিরুদ্ধর হাত ধরে চলে গেল।

তারা আর নেয়নি খোঁজ

দেবাশিষ ঘোষ

তারা আর নেয়নি খোঁজ,
বললে আবার রাগ হবে,
আমি তো আর বলিনি কিছু,
তারা নাকি কাছের মানুষ,
তারা খুব ব্যস্ত মানুষ,
আমি শুধু তাদের পিছু।
তাদের আবার ভীষণ কাজ
নেইকো,
ফালতু বকার টাইম,

আমার তো আর নেইকো কাজ,
নেইকো, তারা আমার মতো,
মাঝ আকাশে উড়ন্ত ফানুস,
হয়তো ভালো বলতে পারেন,
নয়কো, তারা মোটেই বাজে।
সত্যি বলতে, অসময়ে ফালতু
জ্বালাই,
সারাটা দিন।
তরাই কিন্তু লাগে কাজে

তাদের আছে অনেক বন্ধু,
শুনছি নাকি খুব জিনিয়াস,
আমি আবার মাতাল মানুষ,
পেটে পরলেই খুব সিরিয়াস।
এখন আবার বেড়েছে ইগো,
মেসেজ নেই রাত্রি দিন,
কেনো জলদি রিপ্লাই দেবে,
এটার উত্তর আপনি দিন।

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

স্কুল জীবনের মধুর স্মৃতিমালা

চাঁদতারা খাতুন

পঞ্চম সেমেস্টার

জীবনের সবচেয়ে সুন্দর মুহূর্তগুলো কাটে শৈশব এবং কৈশোরে, আর সেই সময়ের সেরা স্মৃতিগুলো জড়িয়ে থাকে স্কুল জীবনের সঙ্গে। স্কুল জীবনের প্রতিটি দিন যেন এক একটি গল্প, এক একটি স্মৃতিময় অধ্যায়। যতই আমরা বড় হয়ে যাই, ততই এই দিনগুলোর দিকে ফিরে তাকানোর প্রবণতা বেড়ে যায়। মনে হয়, যদি আবার ফিরে যেতে পারতাম সেই দিনগুলোতে—যে সময়ে কোনো চাওয়া-পাওয়ার জটিলতা ছিল না, ছিল কেবল আনন্দ আর সারল্য।

যদি আজ কেউ আমাকে জিজ্ঞাসা করে, "তোমার জীবনের সবচেয়ে মধুর স্মৃতি কোনটি?" আমি চোখ বন্ধ করে এক কথায় বলব, "স্কুল জীবন।" যদি প্রশ্ন করা হয়, "এর চেয়ে সুন্দর মুহূর্ত কি হতে পারে?" আমি নিশ্চিতভাবে বলব, "না, কখনোই না।"

স্কুল জীবনের বন্ধু-বান্ধবীরা ছিল সবচেয়ে প্রিয়। তাদের সঙ্গে কাটানো মুহূর্তগুলো আজও হৃদয়ে অমলিন হয়ে রয়েছে। সেই ক্লাসরুম, সেই বেঞ্চ, প্রিয় শিক্ষকদের শেখানো কথা, আর বন্ধুদের সঙ্গে ছোটোখাটো মজা—সবই যেন জীবনের রঙিন পাতা। বারো ক্লাস পর্যন্ত শিক্ষাজীবনের এই সীমানা যেন এক অনন্য ভুবন ছিল, যেখানে আনন্দ আর স্মৃতি তৈরির কোনো সীমা ছিল না।

আজও আমি মিস করি সেই দিনগুলো—প্রিয় ক্লাসরুমের প্রথম বেঞ্চ, প্রিয় বান্ধবীদের হাসি, প্রিয় শিক্ষকদের স্নেহ। মনে হয়, যদি সময়কে থামানো যেত, তাহলে সেই স্কুল জীবনের দিনগুলোতেই আটকে থাকতাম।

আমার মনে হয়, জীবনের সবচেয়ে অমূল্য সম্পদ এই স্কুল জীবনের স্মৃতিগুলো, যা কখনো ভুলবার নয়। এই ফেলে আসা দিনগুলো আমাদের জীবনের শিকড়, আমাদের সেরা সময়।

Scanned with OKEN Scanner

Drawing- My Passion

Name - Bhumika Bag

Class - 2nd Semester

Everyone in the world may not be perfect in everything but they may be perfect in something. Every person has some talent hidden inside them which will be revealed some day. Well when it comes to me I can't say I am perfect but I am good at 'Painting and Drawing'.

It all started when I was just 7 years old, with my papa teaching me how to draw a mango. But he never thought that the walls and floor of our house would be my canvas. I used to draw wherever I wanted to, whether it may be the bedroom or the dining room, I was just unstoppable. Seeing this my papa decided that he would admit me at drawing class.Then my class started when I was studying in class 4. Till then I only used crayons and colour pencils to draw but it was my 10th birthday, my papa gave me a water colour set as a birthday gift. Here's my first painting which I did when I was reading in class 1. I really have to thank my parents for keeping all my paintings and drawings safe since my childhood. Well from then onwards I did various paintings, drawings, posters etc. and it was my drawing class which gave me plenty of opportunities to learn and improve my painting and drawing skills. I have never stopped painting. When I was reading in class 10, I got the 1st position in a State level art competition and It was the greatest achievement of my life. I realised if you really love something you will definitely find a way to do it. I started my own drawing school when I was 17 years old.

This is something which makes me happy in doing it and I am gifted with a bit of talent in it. So I won't let it go to waste. This is my story and all I want to say is do what you love and Don't let your talent go to waste. If not for others at least do it for yourself. It will definitely make you happy like me.

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

খেলাধুলা: সুস্থ জীবনের ভিত্তি

দীপেন শীট

দ্বিতীয় সেমেস্টার

পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধুলার গুরুত্ব অপরিসীম। এটি শরীর ও মনের উন্নতিতে সহায়ক। আমার প্রিয় খেলা ফুটবল। ফুটবলের মাঠে বন্ধুদের সঙ্গে লাফালাফি, ছুটোছুটি, আর হইচইয়ের মুহূর্তগুলো ছিল অসাধারণ। খেলার মাঠে কখনো ঝগড়া, কখনো ভালোবাসার বন্ধনে জড়িয়ে যেতাম।

আজ সেই দিনগুলো হারিয়ে গেছে। মাঠভরা সবুজ দেখলে মনে হয়, আবার সবাই মিলে খেলায় মাতি। কিন্তু এখনকার ছেলেমেয়েরা মোবাইল নির্ভর হয়ে পড়েছে। এর ফলে তারা শারীরিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ছে এবং নানা রোগে আক্রান্ত হচ্ছে।

খেলাধুলা কেবল বিনোদন নয়; এটি শরীরকে সুস্থ রাখে এবং মনকে সতেজ করে। সুস্থ-সুন্দর জীবনের জন্য প্রকৃতির মাঝে খেলাধুলার চর্চা অত্যন্ত জরুরি। পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধুলাকে জীবনের একটি নিয়মিত অংশ করা উচিত। এটি শুধু শারীরিক সক্ষমতাই বাড়ায় না, চারিত্রিক গুণাবলিও গড়ে তোলে।

তাই আসুন, আমরা খেলাধুলাকে জীবনের অংশ করি এবং ভবিষ্যৎকে উজ্জ্বল ও সুস্থ করে তুলি।

Scanned with OKEN Scanner

চোখ

নীতিশ কুমার বটব্যাল
শিক্ষাকর্মী

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের স্পোর্টস বোর্ডের অফিস ঘরে তখন চরম ব্যস্ততা। স্পোর্টস অফিসার সুরজিৎ নন্দী বাবু হতাশ গলায় বললেন, "নাহ! খ্রিষ্টান কলেজকে আবারও ফাইনালে দেখতে পাচ্ছি। কেউ আটকাতে পারবে না।" অফিসে তখন আসন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তঃকলেজ ফুটবল টুর্নামেন্টের কোয়ার্টার ফাইনাল নিয়ে আলোচনা চলছে। সেখানে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ফুটবল কোচ কাজী দা, ম্যানেজার সাগর দা, হিসাবরক্ষক অতনু দা, বুদ্ধি দা, ও আশোক দা। আশোক দা জিজ্ঞাসা করলেন, "কী হল স্যার?"

সুরজিৎ বাবু বললেন, "খ্রিষ্টান কলেজ আবারও ফাইনালে উঠবে এবং তৃতীয়বারের মতো চ্যাম্পিয়ন হবে। ওই কবিকঙ্কণ ওদের হারাতে পারবে না।" কিন্তু ফুটবল কোচ কাজী দা আত্মবিশ্বাসী কণ্ঠে বললেন, "না স্যার, আমার ফুটবল বুদ্ধি বলছে কবিকঙ্কণই খ্রিষ্টান কলেজকে হারাবে। আমি তাদের খেলা দেখেছি। কয়েকটা ভালো ফুটবলার আছে, তারা যদি সেদিন সেরা খেলাটা খেলতে পারে, তবে খ্রিষ্টান কলেজ হারবেই।" সুরজিৎ বাবুর মুখে হাসি ফুটল। তিনি বললেন, "পারবে বলছেন? দেখা যাক!"

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

ম্যাচের দিন

১৫ নভেম্বর ২০১৫, বুধবার। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে শুরু হল দ্বিতীয় কোয়ার্টার ফাইনাল– বাঁকুড়ার খ্রিষ্টান কলেজ বনাম হুগলির কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম মহাবিদ্যালয়। খেলা শুরু হতেই খ্রিষ্টান কলেজ ঝাঁপিয়ে পড়ল কবিকঙ্কণের উপর। তাদের আভিজাত্য—গত দুইবারের চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব—মাঠজুড়ে দৃশ্যমান। স্পোর্টস বোর্ডের সদস্যরা শঙ্কিত। মনে হচ্ছে, কবিকঙ্কণ এই বুঝি গোল খেয়ে বসে।

কিন্তু কবিকঙ্কণের ডিফেন্স দৃঢ়। আক্রমণ রুখে দিয়ে তারা ধীরে ধীরে খেলার নিয়ন্ত্রণ নিতে শুরু করল। মাঝমাঠে সৌমদীপ, চিচি (হারাধন), দীপঙ্কর, এবং গৌরব খেলাটিকে স্থিতিশীল করে নিজেদের দিকে টেনে নিল। ওপরে ন্যান্টা (হীরা মণ্ডল) এবং লালমোহন বল ধরে রাখতে ব্যস্ত।

হঠাৎ ডানদিক থেকে রবি ওভারল্যাপ করে উঠে এসে একটি বিষাক্ত ক্রস বাড়াল। ন্যান্টার হেড! খ্রিষ্টান কলেজের জালে বল—গো-ও-ও-ল! তখন খেলার ১৫ মিনিট। খ্রিষ্টান কলেজ গোল খেয়ে থমকে গেল।

তারপর খেলার রাশ কবিকঙ্কণের হাতে। মাঝমাঠে তাদের অবিরাম পাসিং খেলায় খ্রিষ্টান কলেজ বিভ্রান্ত। কর্ণার পেল কবিকঙ্কণ। চিচির নেওয়া কর্ণার থেকে রবির অনবদ্য শটে স্কোর হল ২-০। আনন্দে উচ্ছ্বসিত কবিকঙ্কণের সমর্থকরা। হাফটাইমে ফলাফল ছিল ২-০।

বিরতির পরের উত্তেজনা

বিরতির ঠিক সাত মিনিট পর খ্রিষ্টান কলেজ একটি কর্ণার পেল এবং সেটি থেকে গোল করল। ফলাফল দাঁড়াল ২-১। খ্রিষ্টান কলেজ তখন জয়ের আশায় মরিয়া। তাদের সমর্থকেরা প্রবলভাবে উৎসাহ দিচ্ছে।

Scanned with OKEN Scanner

এর মধ্যেই দীপু মারাত্মকভাবে আহত হল। মাঠ থেকে কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে গেল সে। তার পরিবর্তে মাঠে এল অর্জুন। স্পিড এবং লড়াকু মানসিকতার জন্য অর্জুন ছিল অসাধারণ।

খেলা তখন অতিরিক্ত সময়ে। যে কোনো মুহূর্তে বাঁশি বাজবে। হঠাৎ অর্জুন বল নিয়ে পেনাল্টি বক্সের বাইরে থেকে একটি জোরালো শট করল। পলকের মধ্যে বল খ্রিষ্টান কলেজের জালে। রেফারির বাঁশি বাজল—গো-ও-ও-ল!

কবিকঙ্কণের সমর্থকরা আনন্দে লাফিয়ে উঠল। স্পোর্টস বোর্ডের সদস্যরা কাজী দাকে অভিনন্দন জানিয়ে বলল, "সত্যি, কাজী দা, তোমার চোখ আছে!"

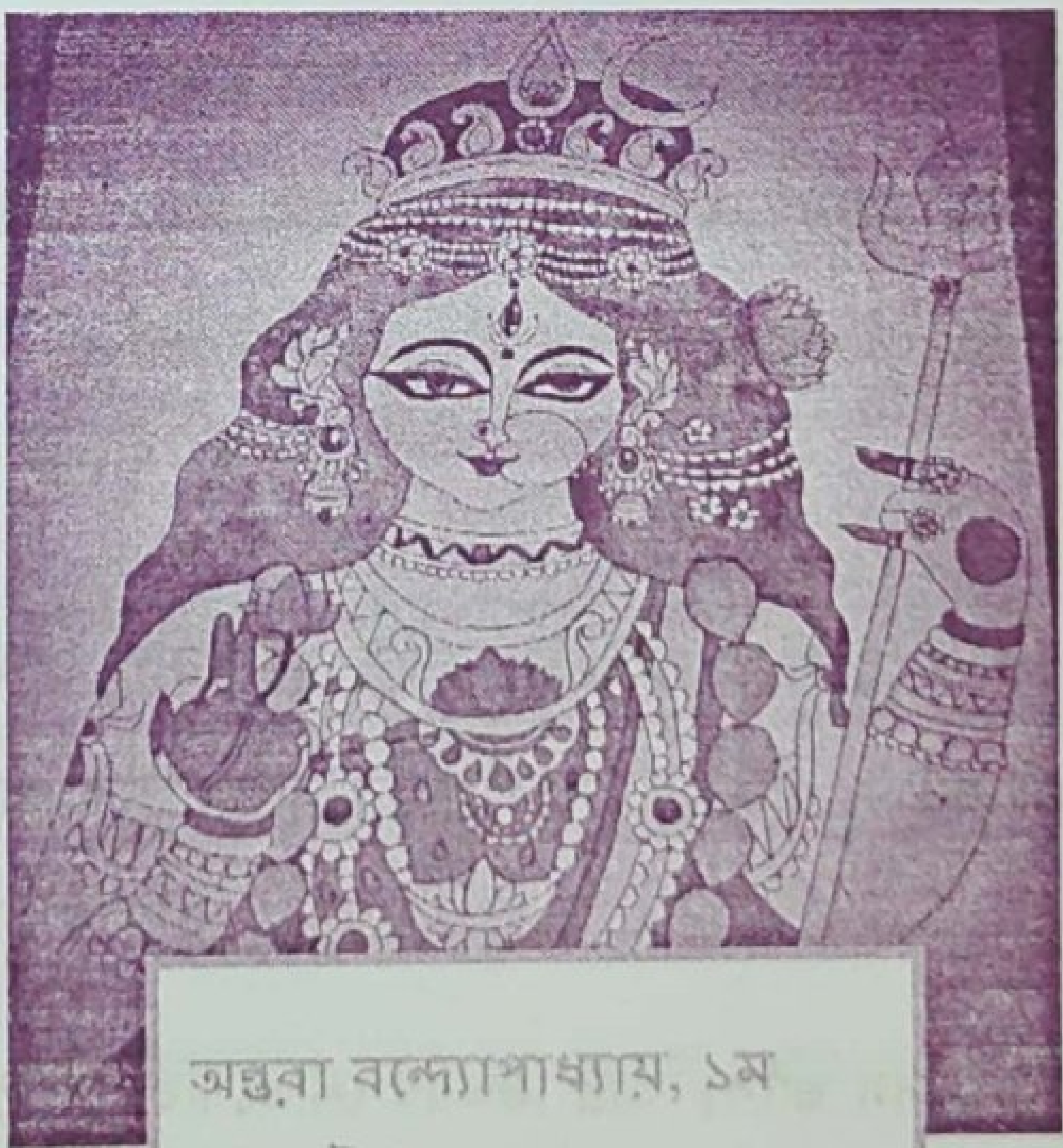

অন্তরা বন্দ্যোপাধ্যায়, ১ম সেমেস্টার

কলেজের ২১৩ নম্বর রুম

গোপাল পণ্ডিত

অধ্যাপক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ

কাঠফাটা রোদে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে কলেজটা। খুঁটোয় বাঁধা নিরীহ গরুর মত, নির্বাক দৃষ্টি। তীব্র গরম সহ্য করছে নির্বিবাদে। ধূসর পাহাড়ের মত। নিশ্চল, নিশ্চুপ। বাতাসে আগুনের হলকা বইছে এক নাগাড়ে। ছ্যাঁকা লেগে লেগে সাদা গা বদলে কালো হয়ে যাচ্ছে বিচ্ছিরিভাবে। চার পাশের লতাগুলো তৃণ পুড়ে ছাই। উদ্ভিদকুলের নীলমনি ঐ বাবলাগাছটার কি কঠিন জান। কি অদম্য প্রচেষ্টায় ছোট ছোট হলুদ হলুদ ফুল ফুটিয়ে আধশোয়া হয়ে দাড়িয়ে আছে ভীষ্মের শরশয্যার মত। ফুলগুলো ঠিক যেন ফার্স্টসেমের মেয়েদের নাকের উপর নাকছাবির মত। সুন্দর আর এট্রাক্টিভ। নীচু ডালটার ছায়ায় বসে হাঁপাচ্ছে কালো হলুদ রঙের একটা অজানা পাখি। বাঁকা লম্বা তার ঠোঁট। মাথায় ধুতরো ফুলের বৃত্তের মত ছোট একটা ঝুঁটি। ইসকাপনের সাহেবের টুপিতে আঁকা নকসার মত ।

অপর দিকে –

আমরা স্টাফরুমে নিজেদের মত করে সময় কাটাচ্ছি। কেউ মুঠোফোন দেখতে ব্যস্ত। কারও চোখ ল্যাপটপের স্ক্রিনের উপরে আটকে। দু একজন টিচার গল্পের বইয়ে ডুবে আছে। বাকিরা হি হি হো হো করছে বেশ মজায়।

বাইরে জৈষ্ঠের হিটওয়েভ চলছে প্রবল ভাবে। আর ভিতরর লোডসেডিংএর দুরন্তপনায় অস্থির। মাথা নষ্ট করা পরিস্থিতি।

এমন সময় স্বর্গের দেবদুতের মতই হাজির হলেন রঞ্জন বাবু। মনোজদাকে সঙ্গে করে। হাতে একটা স্টিলের থালা। থালায় ভরা ফালা ফালা করে কাটা লাল টকটকে তরমুজ।

Scanned with OKEN Scanner

এসে হাসতে হাসতে বললেন

"নিন, সবাই তরমুজ খান। গরমে শরীর ঠান্ডা হবে।"

"নিতাই বাবু আপনি শুরু করুন। বুজুর্গ লোগ।"

নিতাই বাবু থালা থেকে একফালি তুলে নিয়ে এককামড় বসালেন, তারপর তৃপ্তিভরা কণ্ঠে জানালেন "খুব মিষ্টি আছেরে, কোত্থেকে নিলি।"

রাউন্ড দিয়ে টেবিলে টেবিলে বিলি করতে করতে যখন আমার সামনে এল, সেই সময় আমার ফোনটা বেজে উঠল। দেখলাম আননোন নাম্বার। আমি রিসিভ করলাম।

"হ্যালো, কে?"

অপর প্রান্ত থেকে একটা ছেলের গলার আওয়াজ পেলাম। "স্যার ক্লাস নেবেন না?"

শুনে আমি যার পর নাই অবাক হলাম। ঘড়িতে তখন দুপুর আড়াইটা বাজে। ঐ টাইমে আমার অবশ্য একটা ক্লাস ছিল। সিক্স সেমেস্টারের জেনারেল ক্লাস। সেই দিন অতিরিক্ত গরমের জন্য ছেলে মেয়েরা এমনিতেই খুব বেশী কলেজে আসেনি। সাড়ে দশটার অনার্স ক্লাসই হয়নি। আর আড়াইটায় ক্লাস! তাও আবার জেনারেলের!

"স্যার আসুন, আমরা ২১৩ নম্বর রুমে বসে আছি।" আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "তোমরা কতজন আছো?" উত্তর এল "ছয় জন"

"ঠিক আছে আসছি , বসো।"

ফোনটা কেটে পকেটে ভরে রাখলাম। তার পর বোতল থেকে এক ঢোক জল খেয়ে বুক সেল্ফ থেকে এ্যাটেনডেন্স বুক আর চক ডাস্টার নিয়ে যাচ্ছি। পিছন থেকে বিধানবাবু প্রশ্ন করলেন, "কোথায় যাচ্ছো?"

-"ক্লাস নিতে" উত্তর দিলাম।

-"স্টুডেন্ট কেউ আছে?"

Scanned with OKEN Scanner

-"হ্যাঁ, ফোন করলো তো।"

রঞ্জন বাবু নাছোড়বান্দা। খেতেই হবে। খপ করে আমার হাতটা ধরে ফেললেন। "ও গোপাল দা, তরমুজ খেয়ে যান"।

ওনার কথা ফেলতে পারলাম না। একটুকরো তরমুজ মুখে নিয়ে পুরলাম আর এক টুকরো আই কিউ এসি রুমে প্রভাত বাবুকে দিয়ে ক্লাস নিতে চললাম।

সিঁড়ি বেয়ে ধীরে ধীরে যখন উপরতলায় উঠলাম তখন আমার মনের মধ্যে একটা অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটে গেল। মনে হল আমি যেন আচমকা অনাহুত ভাবে এক অচেনা, অজানা,জনমানবহীন দেশে চলে এসেছি। ঠিক যেন তেপান্তরের মাঠে আমি একা দাড়িয়ে আছি- এখানে কোনও রক্তমাংসের শরীরের উপস্থিতি অনুচিত এবং বেমানান।

কেউ কোথাও নেই। এক দম শুনসান। নিস্তব্ধ। থমথমে ভাব। শুন্যতা তিমির মত হাঁ করে দাড়িয়ে আছে। কেউ ঢুকলেই মুহূর্তে গিলে ফেলবে।

করিডর দিয়ে একটু করে এগিয়ে যেতেই জিওগ্রাফি ল্যাবের কাছে একটা পায়রা ঝটপট ঝটপট করতে করতে আমার গা ঘেঁসে বেরিয়ে গেল। আমার সারা গা কাঁটা দিয়ে উঠল। আর একটু এগিয়ে যেতেই স্মার্ট ক্লাস রুমের কাছে একটা ধেড়ে ইদুর আমার সামনে দিয়ে এ ধার থেকে ও ধারে চলে গেল দ্রুত। তারপর এক ধরনের আঁশটে গন্ধ আমার নাকের মধ্যে প্রবেশ করল।

এই ভাবে ভীতু পরিবেশের মধ্যে হাঁটতে হাঁটতে যখন প্রায় ২১৩ নম্বর রুমের কাছাকাছি চলে এসেছি তখন কারও গলার আওয়াজ আমার কানে এল। ভেতরে কারা যেন কথা বলাবলি করছে। ভাবলাম ঐতো ভেতরে ছাত্ররা আমার জন্য অপেক্ষা করছে। ভরসায় বুক ভরে গেল। মনে মনে হাসলাম। আর হটাৎ দুর্বল হয়ে যাওয়া মনটাকে বকলাম, এতক্ষন কি সব ছাইপাঁশ ভাবছিলি , বাঁদর, দিন দুপুরে।

কিন্তু আমার আশ্চর্য হতে তখনও বাকি। শেষের দিকটা আমি খুব তাড়াতাড়িই হাঁটছিলাম। মাথা হেঁট করেই রুমের মধ্যে ঢুকে পড়লাম।

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

চৌকাঠ পেরিয়ে ছাত্রদের দেখেই আমার আত্মারাম খাঁচাছাড়া। পা দুটো অসাড় হয়ে গেল। মাথার চুল খাড়া হয়ে গেল। বুকের ভেতরাটা ধড়াস ধড়াস করছে। গলা শুকিয়ে কাঠ।

এরা কারা? এই অদ্ভুত দর্শন লোকগুলো কি সত্যিই মানুষ? নাকি অন্য জগতের জীব? এল কিভাবে? ক্লাসে বসে করছেই বা কি?

হাজার প্রশ্ন ভীড় করে বসল। ভীরু মনের মধ্যে।

দুজন বুড়ো। চারজন জোয়ান লোক। বেঞ্চিতে বসে বসে এতক্ষন খুনশুটি করছিল। একে অপরকে চিমটে দিচ্ছে। খিমচে দিচ্ছে। কিল মারছে। চুল টানছে। কেউ আবার হেসে গড়িয়ে পড়ছে। আমি আচমকা ওদের জগতে ঢুকে পড়াতে ওদের আনন্দ অনুষ্ঠানে ছেদ ঘটল। প্রথমত ঘাবড়ে গেল। স্তব্ধ হয়ে বসে রইল কিছুক্ষণ। তারপর ওরা বিরক্ত হল। রোষ দৃষ্টিতে আমার পানে চেয়ে রইল।

আমারও "ন যযৌ ন তস্থৌ" অবস্থা

দরদর করে ঘামছি। চক ডাষ্টারটাকে এমন ভাবে চেপে ধরেছি যে চকটা গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে পড়ছে মেঝেতে।

লোকগুলোর মধ্যে একজন যে দরজার দিকে পিছন ফিরে বসেছিল সে ঘুরে উঠে দাঁড়াল, বেশ মোটাসোটা। গায়ে ডোরাকাটা গেঞ্জি। ভুঁড়ির নীচে প্যান্ট। বেল্ট সমেত প্যান্টটাকে পেটের উপর তুলতে তুলতে হেসে বলল,

স্যাঁর, ক্লাঁস নেঁবেন নাঁ কি?

আমি ফিস ফিস করে অস্পষ্ট উচ্চারন করলাম, "কল্যান দা!" কল্যান দা সেই অম্লান হাসি হেসে ঘাড় কাৎ করে দাঁড়িয়ে আছে। চেনাজানা লোক দেখে একটু স্বস্তি পেলাম। ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসিও ফুটে উঠলো বোধ হয়। কিন্তু ওদের সংসারের খবর জিজ্ঞাসা করতে সাহসে কুলোলো না।

Scanned with OKEN Scanner

নায়ক

প্রভাত চন্দ্র হাজরা

অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ

১.

ঘাসের উপর থেকে পলিথিনের প্যাকেটটা কুড়িয়ে নিয়ে সেটাকে ডাস্টবিনে ফেলে দিয়ে বেঞ্চে বসে ডানদিকে তাকাতেই চমকে উঠলেন স্নেহময়বাবু। হাতবিশেক দূরে একটা জবাগাছের আড়াল থেকে একটা লোক তাঁর দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। প্রথমটায় স্নেহময়বাবু ভাবলেন বুঝি চোখের ভুল। চোখের বাইফোকালটা খুলে একবার রুমাল দিয়ে মুছে নিয়ে আবার ভালো করে তাকিয়ে দেখলেন তিনি। না। ভুল নয়। লোকটা সত্যি তাঁর দিকে অপলক তাকিয়ে আছে; যেন এতক্ষণ ধরে তাঁরই দৃষ্টি আকর্ষনের চেষ্টায় ছিল লোকটা।

নভেম্বরের মাঝামাঝি। এখনো তেমন ঠান্ডা পড়েনি এবছর। প্রকৃতির খামখেয়ালিপনার এও এক নজির আর কি! এই মাত্র বছরপাঁচেক আগেও দীপাবলির পর থেকে বাতাসে শিরশির করে ঠান্ডা বাতাস বওয়া শুরু হয়ে যেতো। টুপটাপ করে হিম পড়তে শুরু করত বিকেলের কিছু পর থেকেই। স্নেহময়বাবুর মনে আছে প্রত্যেক বছর কালিপুজোর সময়টায় শীতের প্রথম আগমনটিকে উপেক্ষা করে সর্দি-টর্দি লেগে যাচ্ছেতাই অবস্থা হত ওঁর। আর এখন গরম যেন আর যেতেই চায় না। তবে হ্যাঁ, দিন বেশ কিছুটা ছোট হয়ে গেছে। এখন বাজে সওয়া পাঁচটা। আর মাত্র কয়েক মিনিট, তারপরেই আচমকা সন্ধ্যের অন্ধকার নেমে আসবে।

মাঝে মাঝেই দুপুরের হাল্কা ভাতঘুমের পর এই পার্কে বেড়াতে আসেন স্নেহময়বাবু। বাচ্চাদের পার্ক। শহরের পৌরসভার নিয়ন্ত্রণে থাকা এই চিলড্রেন্স পার্কটি সাড়ে তিনটের পর থেকে জমজমাট হয়ে ওঠে বাচ্চাদের কোলাহলে। ছুটোছুটি, হুড়োহুড়ি চলতে থাকে সন্ধ্যে পর্যন্ত।

সবচেয়ে নাকাল হন এইসব বাচ্চাদের অভিভাবকেরা। পাঁচটা বাজলেই পার্কের চৌকিদার হুইসল বাজিয়ে জানিয়ে দেয় পার্ক বন্ধের সময় উপস্থিত। এই সময়কার দৃশ্যটি হয় দেখার মত। আরো কিছুক্ষণ থাকার আবদারে সব বাচ্চারা তাদের বাবা-মায়েদের কাছে তারস্বরে কান্না জুড়ে দেয়। কেউ পার্কের ঠিক মাঝখানে থাকা দোলনার লোহার চেন ধরে গোমড়া হয়ে বসে থাকে। কেউ লুকিয়ে পড়ে স্লাইডের সিঁড়ির নিচে। কেউ আবার জিরাফের স্ট্যাচুর পেছনের একটা পা এমন করে আঁকড়ে ধরে থাকে যেন কারো শক্তি নেই তাকে সেখান থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে যাবার। এইসব রঙ্গ দেখে স্নেহময়বাবু মনে মনে হাসেন আর ভাবতে থাকেন কোথায় তাঁদের ছেলেবেলার সেইসব খোলা মাঠঘাট আর কোথায় এই পাঁচিলঘেরা, সময়নিয়ন্ত্রিত শিশু-উদ্যান! বেচারা বাচ্চাগুলোর জন্য খারাপ লাগে তাঁর। সারাদিনের পড়াশুনার পর সামান্য সময়ের জন্য এই সাজানো গোছানো কৃত্রিমতার মধ্যেই তারা নিজেদের শৈশবকে খুঁজে নিতে আসে। পরবর্তী প্রজন্ম ঠিক কোন দিকে যাচ্ছে জানা নেই কারো। স্নেহময়বাবু ভাবেন, হারানো শীত বা বর্ষার মতই পৃথিবী থেকে বুঝি হারিয়ে যাচ্ছে শৈশবের ঋতু।

স্নেহময় সরকার – নামজাদা লেখক। বয়স তাঁর পঁয়তাল্লিশের কোঠায়। উপন্যাসই বেশি লেখেন আজকাল। গত দশ বারো বছর ধরে প্রতি বইমেলায় আর পুজোয় তাঁর বই বেরোতে না বেরোতেই বেস্টসেলার। আজকালকার এইসব থ্রিলার, ডিটেকটিভ আর তান্ত্রিকের গল্পের ভিড় ঠেলে তাঁর সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক গল্পগুলি পাঠককে নতুনত্বের স্বাদ দিয়েছে। স্নেহময়বাবু জানেন শিল্পের বাজারে নতুন জিনিস চিরকাল নতুন থাকে না। তাই প্রতি উপন্যাসেই তিনি চেষ্টা করেন আরো অভিনব সব বিষয়বস্তু নিয়ে আসার। বিশেষ করে আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি যেমন স্মার্টফোন, হোয়াটসঅ্যাপ, ইনস্টাগ্রাম ইত্যাদির উল্লেখ তাঁর গল্পকে তরুণ-তরুণীদের বেশ জনপ্রিয় করে দিয়েছে। কলেজের প্রেম, সম্পর্কের দোটানা, ধনী যুবকের সিভিয়ার আইডেন্টিটি ক্রাইসিস – এইসব তাঁর কাহিনীর বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে। আজ থেকে প্রায় তেরো বছর আগে প্রকাশিত তাঁর প্রথম উপন্যাস *বন্দীগ্রামের কারখানা* তাঁকে রাতারাতি বিপুল জনপ্রিয়তা এনে দেয়। কয়েকটা চরিত্রের জটিল মনস্তাত্ত্বিক টানাপোড়েন নিয়ে লেখা এই উপন্যাসটি প্রকাশের সাথে সাথে বাঙালি

Scanned with OKEN Scanner

পাঠক বোঝে, সাহিত্যের জগতে এক নতুন তারকার জন্ম হল – যার ভাষা নতুন, ভঙ্গী নতুন আর লিখনশৈলী সরাসরি পৌঁছে যায় পাঠকের মনের অন্দরে।

উপন্যাসের জগতে এই মূহুর্তে স্নেহময়বাবুর ধারেকাছে আসার মত কেউ নেই। অদূর ভবিষ্যতে কারো আসার সম্ভাবনা আছে বলেও মনে হয় না। তবে ইদানীং রামানুজ ভক্ত বলে এক ছোকরা কিছু ধর্মীয় গোছের উপন্যাস লিখে খানিকটা জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। কিন্তু তার লেখায় সে ঝাঁঝ নেই যা দিয়ে এই ছোকরা স্নেহময়বাবুর মত লেখককে টেক্কা দিতে পারবে। সেটা তিনি তার *পুরুষোত্তম* উপন্যাসটি একবার পড়েই বুঝে গেছিলেন। তিনি ভালোই জানেন শুধুমাত্র ধর্মীয় সুড়সুড়ি দিয়ে বাংলার পাঠককে বাগে আনা যাবে না।

কোথায় সেই প্রাঞ্জল ভাষা, কোথায় সেই অসামান্য চরিত্রচিত্রণ – ঠিক যেমনটা স্নেহময়বাবুর ছিল গোড়া থেকেই। তিনি যখন প্রথম লিখতে শুরু করেন তখন বাংলা সাহিত্যের বাজারে বামাচরণ মিত্র দাপিয়ে রাজত্ব করছেন। বিশাল মাপের ঔপন্যাসিক। দীর্ঘ চৌত্রিশ বছর ধরে গদ্যসাহিত্যে বামাচরণ বাবুর মনোপলি ছিল। বাঙালি পাঠক তাঁকে একবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যনৃপতি বলে মান্য করত। কিন্তু ঐ যে, এক জিনিস দীর্ঘদিন ধরে পরিবেশন করে গেলে একটা সময় পাঠকের তাতে অরুচি ধরে যায়। বামাবাবুর শেষদিকটায় তাইই ঘটে। পাঠক আর তাঁর সেকেলে গদ্যকে নিতে পারছিল না। ঠিক এরকম একটা সময়েই স্নেহময়বাবু তাঁর প্রথম উপন্যাসটি লেখেন। আনকোরা নতুন একজন লেখকের ঝরঝরে সাবলীল গদ্যে পাঠকমহলে ধন্য ধন্য পরে যায়। বলা ভালো, *বন্দীগ্রামের কারখানা* লেখাটিই বামাচরণবাবুর তিনদশকের বেশি আধিপত্যের উপর থাবা বসায় আর জন্ম দেয় নতুন এক নাম – স্নেহময় সরকার। রামানুজ ছোকরার মধ্যে অবশ্য সে এলেম নেই যে স্নেহময়বাবুর আসন এতটুকু টলাতে পারবে।

খুব বেশিদিন নয়, এই মাত্র দু'বছর হল, স্নেহময়বাবুর লেখা একটি নারীবাদি উপন্যাস *শ্রীকন্যা* একটি নামী বিদেশি পুরষ্কার পেয়েছে। তারপর থেকে যেন তাঁর ব্যস্ততা বেড়ে গেছে দ্বিগুণ। আজ এখানে সংবর্ধনা, কাল ওখানে রবীন্দ্র-নজরুল সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা, পরশু সেখানে

Scanned with OKEN Scanner

লিটল ম্যাগ মেলার উদ্বোধন – এইসব লেগেই আছে। তার মাঝখানে নিজের লেখালিখি তো আছেই। তবে এই সব কিছু স্নেহময়বাবু খুব স্মার্টলি সামলে নিতে পারেন। প্রগতিশীল ব্লাডপ্রেসার বা সর্বজনীন সুগার – কোনোটাই তাঁকে এখনো পর্যন্ত কাবু করতে পারে নি। আর তাছাড়া তিনি নিজেকে সবসময় আইডেন্টিফাই করেন কুড়ি থেকে তিরিশের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে। তাঁর মতে, চিকেনের ঠ্যাং চিবুতে যেদিন থেকে তাঁর অরুচি আসবে সেদিন ভেবে দেখবেন বয়স বাড়ছে কিনা। তার আগে কস্মিনকালেও নয়। তাই লেখালেখির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তাঁর চলে বইমেলার আড্ডা, কচি ছেলেমেয়েদের অটোগ্রাফ দেওয়া কিংবা সেলফি তোলার আবদার মেটানো – এইসব।

গত দু'দিন ধরে অবশ্য স্নেহময়বাবুর মনটা খুব একটা ভাল নেই। এই সপ্তাহখানেক হল একটা নতুন লেখায় হাত দিয়েছেন। বইমেলার জন্য। প্রকাশকের হুড়ো শুরু হয়ে গেছে অনেক আগেই। হাতে আর সময়ও নেই বিশেষ। কাজেই চলজলদি যা হোক একটা কাহিনি দাঁড় করিয়ে পাণ্ডুলিপি জমা দিতে হবে। কারণ তিনি জানেন, তাঁর কলম থেকে কিছু বেরোলেই তা সুপারহিট। প্রকাশককে তিনি হতাশ করতে চান না। সে বেচারা আরো একটি বেষ্টসেলারের অপেক্ষায় আছে।

অনেক ভেবেচিন্তে এবারে তিনি ফেঁদেছেন একটি রগরগে ত্রিকোণ প্রেমের কাহিনি। চরিত্রগুলির আর্থসামাজিক অবস্থান, তাদের মূল্যবোধ, একে অপরের সঙ্গে কনফ্লিক্ট, সম্পর্ক, সম্পর্কের অবনতি – এইসব নিয়ে বেশ একটা জমজমাট গল্পকে অত্যাধুনিক মোড়কে পরিবেশন করার কথা ভেবেছেন স্নেহময়বাবু। প্রথম পরিচ্ছেদ শেষ করে পরশু রাত্রেই শুরু করেছেন দ্বিতীয়টি। প্রথম পরিচ্ছেদ বেশ ভালোই উতরেছে। কিন্তু মুশকিল হল, গত দু'দিন ধরে তাঁর লেখা আর এক কলমও এগোয়নি। দু'টো প্রধান চরিত্র নির্মাণ বেশ স্বচ্ছন্দেই করেছেন স্নেহময়বাবু। কিন্তু, আর একটা চরিত্রকে কিছুতেই বাগে আনতে পারছেন না তিনি। আজ, কাল দু'দিন ভেবেও কোনও কূলকিনারা হয়নি। এই এত বছর পর এসে তাঁর কলম অপ্রত্যাশিতভাবে থমকে গেল। এমনিতে পাঠকমহলে তিনি সাবলীল, বাস্তবধর্মী চরিত্রনির্মাণের জন্য বেশ সমাদৃত। কিন্তু এবারে তিনি বেশ ভালোরকমভাবে ফেঁসে গেছেন।

আজ দুপুরের পর থেকেই তাই স্নেহময়বাবুকে একটা অজানা ভয় চেপে ধরেছে। তবে

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

কি তাঁর লেখায় এবার মরচে ধরা শুরু হল? বাজরের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে গিয়ে কি তাঁর কলমে ভাঁটা নেমে এলো? লেখালেখি ছাড়াও অন্যান্য কাজে ইদানিং নিজেকে একটু বেশিই যুক্ত করে রেখেছিলেন স্নেহময়বাবু। তবে কি লেখালেখিকে এতটা অনাদর করা তাঁর ঠিক হয়নি? একটা অদ্ভুত আশঙ্কা সারাক্ষণ জড়িয়ে রেখেছে তাঁকে।

তাই আজ কোনোমতে দুপুরের খাওয়া সেরে বিছানায় একটু গা গড়িয়ে ঘুমন্ত স্ত্রী কল্পনাদেবীকে কিছু না জানিয়েই চুপি চুপি বাড়ি থেকে বেড়িয়ে আসেন স্নেহময়বাবু। আজ একটু নির্জনতা প্রয়োজন তাঁর। একান্তে বসে একটু ভাবতে পারলে খুব ভালো হত। আর এহেন মানসিক অবস্থায় তাঁর এই চিলড্রেন্স পার্কটিকেই বেশ পছন্দের জায়গয়া বলে মনে হয়। এখান থেকে কিছুটা দূরে, প্রায় পাঁচ মিনিটের হাঁটা পথের মধ্যেই অবশ্য আরো একটি পার্ক আছে প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য। কিন্তু স্নেহময়বাবু সেখানে যেতে বিশেষ পছন্দ করেন না। কারণ নির্জনতা ভোগের জায়গা সেটি নয়। সবগুলো বেঞ্চ ভর্তি করে রাখে কপোত-কপোতীরা। ঝোপঝাড়, খোয়াবাঁধানো রাস্তার ধার - কোনও জায়গাটাই খালি থাকে না। আর মাঝে মাঝেই "আপনি, স্নেহময় সরকার না?" প্রশ্নটি ধেয়ে আসে তাঁকে লক্ষ্য করে। কারণ, যে এজ গ্রুপের কথা ভেবে তিনি লেখেন এটা তাদেরই জায়গা। কাজেই প্রায়শই অনুরক্ত পাঠক-পাঠিকার সঙ্গে তাঁর এনকাউন্টার অবধারিত। তারপর সেলফি, অটোগ্রাফ, "আপনার অমুক চরিত্র, তমুক চরিত্র" এসব শুরু হয়। এমনিতে এসব যে তাঁর ভালো লাগে না সে কথা বললে মিথ্যে বলা হবে। কিন্তু আজ না। আজ একটু একা থাকতে চান তিনি।

এই চিলড্রেন্স পার্কের একটি বিশেষ বেঞ্চ তাঁর ভারী পছন্দের। কখনো এখানে এলে তিনি এই পুরনো রংচটা বেঞ্চটাতে বসতেই বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। এখানে তাঁকে খুব একটা বিরক্ত করার কেউ নেই। বাচ্চারা তাঁকে চিনবে না স্বাভাবিক। আর বাচ্চার মায়েরা গ্যাদগেদে বাংলা ডেইলি-সোপ এর বাইরে মুখ তুলে অন্য কিছু দেখার সুযোগ পান বলে তো মনে হয় না। কাজেই...

পার্কের মেনগেট দিয়ে ঢুকে কিছুটা এগিয়ে এসে স্নেহময়বাবুর প্রিয় বেঞ্চটি পার্কের এক নিরিবিলি কোণে দাঁড়িয়ে রয়েছে, এক পুরনো অশ্বত্থ গাছের বিশাল ছায়ার নিচে। গাছটির শিকড় মাটির উপর দিয়ে এঁকেবেঁকে বেরিয়ে এসেছে, সাপের মতো মাটির ওপর নকশা তৈরি করে বেঞ্চের চারপাশে একটা প্রাকৃতিক বেষ্টনী গড়ে তুলেছে। বেঞ্চটি নিজেও সময়ের দাগ বহন করে চলেছে—একসময়ে

Scanned with OKEN Scanner

সবুজ রঙে রাঙানো বেঞ্চটির রঙ আজ জায়গায় জায়গায় চটে গেছে, তার নিচ থেকে মরচে ধরা লোহার কাঠামো উঁকি দিচ্ছে।

সাড়ে পাঁচটার পর বাচ্চারা চলে গেলে পার্ক একদম শুনশান হয়ে পড়ে। সমস্ত কোলাহল মিলিয়ে যায় পড়ন্ত বিকেলের আলোয়। এই সময়টা স্নেহময়বাবুর বড্ড প্রিয় সময়। সাড়ে পাঁচটার পরও কিছুটা সময় তিনি বসে থাকেন পার্কে। অবাঙালি দারোয়ান রোশন সিং এর সঙ্গে তাঁর ভালোই খাতির। রোশন সিংকে একটা দামী সিগারেট খাইয়ে নিজের জন্য তিনি অতিরিক্ত একটু সময় চেয়ে নেন। দারোয়ান খুশি হয়ে হুইশল বাজাতে বাজাতে পার্কের চারদিকে ঘুরতে চলে যায় সতর্ক চোখে। নিজের খেয়ালে সে পার্ক অফিসের দরজা বন্ধ করে, ঘুরে ঘুরে পার্কের সমস্ত লাইট জ্বালিয়ে দেয় এক এক করে। তারপর সমস্ত হয়ে গেলে, কাছেই কোথাও বাম হাতে খৈনী ডলতে [illegible] গান ধরে, "জারা হালকে গাড়ি হাঁকো, জারা ধীরে ধীরে গাড়ি হাঁকো, ও রাম গাড়িওয়ালে..."

আজও এই আধঘন্টা-একঘন্টার লোভে এখানে এসেছেন স্নেহময়বাবু। সারদিনের হইহল্লার পর ধীরে ধীরে পার্কটি একটি নিঃসঙ্গ, বিষন্ন রাত্রি কাটাবার প্রস্তুতি শুরু করছে। চারপাশে দীর্ঘ হয়ে আসে গাছের ছায়া। অদূরে বাতিস্তম্ভের হলুদ আলো আর গোধূলির আলো মিশে তৈরি হয়েছে এক অপার্থিব দৃশ্য। বেঞ্চের পায়ার চারপাশে বুনো ঘাস অসমভাবে গজিয়ে উঠেছে, আর সেগুলোর ফাঁকে ফাঁকে ফুটে আছে ছোট ছোট বেগুনি রঙের ফুল। কাছেই, একটা সরু আর আঁকাবাঁকা পাথরের পথ মাটির মধ্যে দিয়ে এঁকেবেঁকে আরও গভীর বনসদৃশ অংশে চলে গেছে, যেখানে ঘন গাছপালার জঙ্গল বেঞ্চটিকে বাকি পার্কের কোলাহল থেকে আড়াল করে রেখেছে। সামনেই একটি পুরনো, শুকনো ফোয়ারা দাঁড়িয়ে আছে—তার মার্বেলের কিনারাগুলো দীর্ঘ সময়ের ব্যবহারে এখন মসৃণ। ফোয়ারাটিতে এখন আর জল প্রবাহিত হয় না; সেখানে কেবল বৃষ্টির জল জমে থাকে, যেখান থেকে মাঝে মাঝে চড়ুই বা অন্যান্য পাখিরা জল খায়, স্নান করে।

ঠিক এমনি সময়েই আচমকা লোকটাকে দেখতে পান স্নেহময়বাবু। বেশ সন্দেহজনক। কতক্ষণ তাঁর দিকে ওরকম ভাবে চেয়ে আছে কে জানে! কই একটু আগে যখন তিনি একটা বাচ্চার কান্না শুনে ওদিকে তাকিয়েছিলেন তখন লোকটাকে দেখতে পাননি তো! লোকটা কী এতক্ষণ লুকিয়ে

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

ছিলো ঐ জবা গাছটার পেছনে? মতলব কী? একটু অস্বস্তি হল স্নেহময়বাবুর। লোকজন প্রায় কমে এসেছে পার্কে। কিছুক্ষণের মধ্যেই পুরোপুরি ফাঁকা হয়ে যাবে জায়গাটা। তখন শুধু তিনি আর রোশন সিং। এ হেন ব্যক্তিগত অবসরে তৃতীয় এক ব্যক্তির সম্ভাব্য উপস্থিতির কথা ভেবে স্নেহময়বাবুর মনটা বিরক্তিতে ভরে উঠল। যাক গে। এখনই ওকে নিয়ে এতোটা ভাবার মত কিছু হয়নি। নিশ্চয়ই পাগল গোছের কেউ হবে। ঘুরতে ঘুরতে ঢুকে এসেছে পার্কে। রোশন সিং একটু পরেই হয়তো বের করে দেবে। স্নেহময়বাবু আবার নিশ্চিন্ত মনে তাঁর ভাবনার জগতে ঢোকার চেষ্টা করলেন।

কিন্তু না। কিছুক্ষণের মধ্যেই শুকনো পাতার উপর খসখসে পায়ের শব্দ শুনে আবার ডানদিকে তাকিয়ে স্নেহময়বাবু দেখলেন লোকটা আর জবা গাছের পেছনটায় নেই, বরং এক পা দু'পা করে তাঁর প্রায় দশ হাতের মধ্যে এসে পড়েছে। এ তো ভারী বিপদ! কী চায় এই লোক? ছিনতাই এর মতলব? কিন্তু তাঁর কাছে এখন আছেটাই বা কী যে ছিনতাই করবে? পাশে রাখা কাঁধঝোলা ব্যাগে এক জলের বোতল বই তো আর কিছু নেই। আর থাকার মধ্যে কেবল বাঁহাতের কব্জিতে একটা কোয়ার্টজ কোম্পানির ঘড়ি, যার দাম খুব বেশি হলে আড়াইশো। এটুকু নিয়ে হবেটাই বা কী?

চোখ কুঁচকে স্নেহময়বাবু লোকটাকে দেখার চেষ্টা করলেন। দেখে মনে হয় তাঁরই মত মাঝবয়সি, ঈষৎ লম্বাটে গড়নের চেহারার লোক। স্নেহময়বাবুর হঠাৎ একটা কথা মনে হল। এমনিতে প্রকাশ্যে তাঁর শত্রু কেউ নেই। তিনি স্বনামধন্য লেখক, তাঁর সঙ্গে কেউ চট করে শত্রুতা করবেই বা কেন? কিন্তু একটা সম্ভাবনার কথা ঝিলিক দিয়ে গেল তাঁর মাথায়। রামানুজ ছোকরা কোনো বদ অভিসন্ধিতে, তাঁর ক্ষতি করার জন্য এ লোকটাকে পাঠায়নি তো? হতেও তো পারে। লেখার দক্ষতায় পেরে না উঠে তাঁকে একেবারে পৃথিবী থেকেই সরিয়ে দিতে চায় হয়তো। তাই যদি হয়, তাহলে এই মুহূর্তেই তো তাঁর চিৎকার করে রোশন সিংকে ডাকা উচিত। ঐ তো দূর থেকে তার হুইশল শোনা যাচ্ছে। স্নেহময়বাবু কপালে হঠাৎ বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠল। এভাবেই কি তাহলে তাঁর জীবনের ইতি লেখা আছে? নাকি এখনই এতদূর ভাবার কোনো কারনই ঘটেনি?

ধুর, ধুর। শুধু শুধু এত ভাবছেন স্নেহময়বাবু। গায়ে তাঁর এখনো যথেষ্ট জোর রয়েছে সেরকম বুঝলে তিনিও দু'চার ঘুঁষি...

Scanned with OKEN Scanner

বিকেলের শেষ আলো এই জায়গা ত্যাগ করেছে একটু আগেই। লাইটপোষ্টের হলুদ আলোয় চারধারে কেমন হলদেটে আভা। এর থেকে বেশি কিছু আর ভাবার সময় পেলেন না স্নেহময়বাবু।

গুটি গুটি পায়ে মূর্তিমান অন্ধকারের মত লোকটা একদম তাঁর সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

২

"আমাকে একটা সুযোগ দেবেন স্যার?"

অপ্রত্যাশিত এই প্রশ্নে প্রথমেই একটু থতমত খেলেন স্নেহময়বাবু। তারপর খুব ভালো করে চোখ তুলে দেখলেন, সামনের মানুষটিকে লোক না বলে একজন যুবক বলাই ভালো। তাঁর বয়সি তো নয়ই, বরং তাঁর থেকে অন্ততঃ বছর দশ বারোর ছোটো হবে। পড়নে একটা কালোর উপর আড়াআড়িভাবে সাদা স্ট্রাইপ দেওয়া টি-শার্ট, একটা নীলরঙা ছিটের কাটানো প্যান্ট। মুখে তিন-চারদিনের না-কামানো দাড়ি। ক্ষীণ আলোয় এর থেকে বেশি বোঝা সম্ভব হল না স্নেহময়বাবুর পক্ষে। প্রশ্নটা করে ছেলেটি সামান্য লাজুক মুখে হাতদুটোকে সামনে কোমরের কাছে জড়ো করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল তাঁর প্রত্যুত্তরের অপেক্ষায়।

আগন্তুককে এত কাছ থেকে দেখে আর তার প্রশ্ন শুনে কিছুক্ষণ আগে জমাট বেঁধে আসা আশঙ্কা কিছুটা হলেও কমে গেল; যদিও তখনো পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হতে পারেননি স্নেহময়বাবু। হতেও তো পারে প্যান্টের পকেটে বা টি-শার্টের নীচে কোথাও ছুরি বা অন্য কিছু লুকিয়ে রেখেছে, সুযোগ পেলেই হয়তো ঝাপিয়ে পড়বে তাঁর উপর। কিন্তু ছেলেটির মুখ আবছা আলোয় যেটুকু দেখেছেন তাতে তাকে মোটেই হিংস্র বলে মনে হয় না। বরং বেশ একটা মায়া মেশানো অথচ বুদ্ধিদীপ্ত চোখমুখ, সঙ্গে কিছুটা দুশ্চিন্তার ছায়া। আর সাতপাঁচ না ভেবে এবার স্নেহময়বাবু সরাসরি আগন্তুককে প্রশ্ন করলেন, "তুমি কে বাপু? তোমাকে তো ঠিক..."

ছেলেটি সেইরকম ভাবেই দাঁড়িয়ে কোমল কণ্ঠে উত্তর দিলো, "আজ্ঞে, আমি অনেক দূর

Scanned with OKEN Scanner

থেকে আসছি। আপনি আমাকে চিনবেন না। আমি এখানকার নই স্যার।"

স্নেহময়বাবু এবার একটু জোরের সাথে বিরক্তি প্রকাশের ভঙ্গিমায় ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করলেন, "তা আমার কাছে কী ব্যাপার? আর এমন অসময়ে, এরকম জায়গাতেই বা কেন?"

কথা বলতে বলতে এবার স্নেহময়বাবুর পায়ের কাছে বসতে উদ্যত হল ছেলেটি।

"আরে, আরে, আরে, করছ কী? এখানে বসছ কেন? বসতে হলে এই পাশটায় বোসো।" স্নেহময়বাবু একেবারে অস্থির হয়ে উঠলেন। তারপর পা দুটোকে একটু জড়ো করে বেঞ্চের একটু ভেতরের দিকে টেনে নিলেন।

ছেলেটি সলজ্জ মুখে উত্তর দিল, "না স্যার। আপনি নমস্য ব্যক্তি, আপনার পদতলে বসা আমার সৌভাগ্য। আমি সেই অনেক দূর থেকে শুধু আপনার সঙ্গে একটু দেখা করতে এসেছি। আমাকে একটা সুযোগ দিন না স্যার।"

স্নেহময়বাবুর আর কিছু বুঝতে বাকি রইল না। এ ছেলে নিশ্চয়ই কোন গ্রাম-গঞ্জের উঠতি লেখক, কোথাও ভাগ্যে শিকে ছেঁড়েনি বলে তাঁর কাছে এসেছে কোন লেখা ছাপিয়ে দেবার অনুরোধ নিয়ে। স্নেহময়বাবুর আর বিরক্তির শেষ রইল না। এই সব তেল দেওয়া উঠতি লেখকদের তিনি দু'চক্ষে দেখতে পারেন না। এই সব লেখকদের বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই লেখার কোনো মেরিট থাকে না। এরা শুধু চায়, নামী কাউকে ধরে তাকে যারপরনাই তৈলমর্দন করে তড়তড় করে উপরে উঠতে।

স্নেহময়বাবু নিজে তাঁর এত বছরের কেরিয়ারে একটিবারের জন্যও কাউকে তাঁর লেখা ছাপিয়ে দেবার জন্য অনুরোধ করেন নি। এমনকি, বিখ্যাত হবার আগেও কখনো কোনো প্রকাশকের দরজায় দরজায় ঘোরেননি। লিখতেন, পোষ্ট করতেন, কখনো লেখা ছাপা হতো, কখনো না। কিন্তু তাই বলে...

শুধুমাত্র একবার তিনি তাঁর একটি ছোটগল্প নিয়ে গিয়েছিলেন বামাচরণ বাবুর অফিসে। বামাচরণ বাবু তখন বাংলা সাহিত্যে শেষ কথা। সেসময় তিনি *লোকায়ত* বলে একটি লিটল ম্যাগাজিন সম্পাদনা করতেন। স্নেহময়বাবুর মনে আছে, কলিমুদ্দিন স্ট্রিটে বামাচরণ বাবুর অফিস

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

থেকে কীভাবে অপমানিত হয়েছিলেন তিনি। তারপর থেকে ভয়ানক জেদে তিনি প্রতিজ্ঞা করেন, লেখা ছাপা হোক বা না হোক, প্রকাশকের দরজায় আর নৈব নৈব চ!

কিন্তু এ ছেলে কি জানে না যে স্নেহময়বাবু কোন ম্যাগাজিন সম্পাদনা করেন না? তাহলে তাঁর কাছে আবার লেখা ছাপাবার আর্জি কেন? এ তো ভারি মুশকিলে পড়া গেল! অনেক দিন পর ভারাক্রান্ত মনে আজ এখানে এসেছেন তিনি।নিজের লেখাটার জট ছাড়াতে গেলে এরকম প্রকৃতির মাঝে এই নিঃসঙ্গতাটুকু তাঁর ভারি প্রয়োজন। কিন্তু এ ছেলের ভাবগতিক থেকে মনে হয় না সহজে তার হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে।

ছেলেটি বসে আছে একদম তাঁর পায়ের গোড়ায়। এখনো সেই রকম প্রত্যুত্তরের আশায় ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে আছে তাঁর মুখের পানে। স্নেহময় সরকার আরো একবার ওর মুখের দিকে তাকিয়ে কিছু একটা বোঝার চেষ্টা করলেন। দু'দিনের অনাহারের ছায়া রয়েছে কি ওর মুখে? হ্যাঁ, ঠিক। আর সঙ্গে দীর্ঘদিনের পরিশ্রমজনিত ক্লান্তির একটা ছাপ স্পষ্ট ফুটে রয়েছে কোমল মুখখানায়। এইবার ছেলেটির প্রতি একটু যেন মায়া হল স্নেহময়বাবুর। ভাবলেন, সময়টা যখন এমনিতেই নষ্ট হবে, তখন এ বেচারার সাথে একটু কথাই বলা যাক। অনেক সময় পাঁচরকম লোকের সাথে কথা বললে ভাল গল্পের প্লটও জুটে যায়। আর তাছাড়া এমন রহস্যময় অনুগ্রহপ্রার্থীর সঙ্গে রোজ রোজ তো আর মোলাকাত হয় না। কৌতুহলভরে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "তা নাম কী বাপু তোমার?"

ছেলেটি চট করে উত্তর দিল, "আজ্ঞে, আমার নাম শিবে, স্যার।"

শিবে! এ আবার কেমনধারা নাম! চলতে ফিরতে 'শিবু' নামটা প্রায়শই শোনা যায় বটে, কিন্তু শিবে? স্নেহময়বাবু ভাবলেন, এও হয়তো শিবনাথ বা শিবচরণ নামের আর এক অপভ্রংশ। জিজ্ঞেস করলেন, "ভাল নাম শিবনাথ বুঝি?"

সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটি ঈষৎ প্রতিবাদের সুরে বলে উঠল, "না না স্যার। আমার ঐ একটিই নাম - শিবে। আমি শিক্ষিত বেকার কিনা। তাই সবাই আমাকে শি.বে. বলেই ডাকে।"

'শিক্ষিত বেকার' থেকে শিবে! ছেলেটির মস্করায় কিছুটা ক্ষুণ্ণ হলেন স্নেহময়বাবু। কিঞ্চিৎ বিরক্তির সুরে বললেন, "এটা আবার একটা নাম হল? সে তুমি শিক্ষিত-অশিক্ষিত যাই

Scanned with OKEN Scanner

হও না কেন, পিতৃ-মাতৃদত্ত নাম তো একটা থাকবে?"

সপ্রতিভ গলায় এবার শিবের উত্তর আসে, "না স্যার। অশিক্ষিত চাকুরিজীবি হলেও আমার একটা গালভরা নাম থাকতো, কিন্তু আমি শিক্ষিত বেকার কিনা। তাই যেখানেই যাই, সমাজ আমাকে ঐ নামেই ডাকে; বাবা-মা'র দেওয়া নাম আমি নিজেও ভুলতে বসেছি প্রায়। এই আমার পি.এইচ.ডি-র দিব্যি খেয়ে বলছি স্যার!" বলেই ছেলেটি নিজের বুড়ো আঙ্গুল আর তর্জনী দিয়ে কণ্ঠাটা ধরে কসম খাওয়ার ভঙ্গি করল।

পি.এইচ.ডি শুনে স্নেহময়বাবুর বিষম খাবার জোগাড়। এই ছেলে বলে কিনা তার পি.এইচ.ডি রয়েছে! রোগাটে গড়ন, চোখেমুখে মলিন দৈন্য। খেতে পায় কিনা ঠিক নেই। ডক্টরেট ডিগ্রীর তবে কী এই হাল হয়েছে! পথচলতি যে কেউ পি.এইচ.ডি. করে নেবে! বা এমনও হতে পারে এ ব্যাটা ডাঁহা মিথ্যে কথা বলছে। মদ-টদ খেয়ে আসেনি তো! সত্যি বলতে এই খেজুরে আলাপ স্নেহময়বাবু আর বেশিক্ষণ হয়তো সহ্য করতে পারবেন না। আর এমনিতেই এসব নিষ্কর্মা বেকারদের প্রতি তাঁর একটা তীব্র এলার্জি আছে। সারাদিন কাজ নেই, কম্ম নেই, টোটো করে ঘুরবে, নেশাভাং করবে আর যত অসামাজিক কাজের সাথে জড়াবে। ওঁর পাড়াতেও রকে বসা কয়েকজন আছে যারা ফি-বছর পুজোর সময় চাঁদা তুলতে বাড়ি আসে। বেশি কথা না বাড়িয়ে স্নেহময়বাবু চাঁদা দিয়ে দেন। এগুলো সমাজের আপদ। যত বিদেয় করা যায় ততই ভালো।

তিনি আবার কিছু বলে ওঠার আগেই শিবে বলল, "তাছাড়া আমার নামের আরো একটা তাৎপর্য আছে স্যার। শিবে'কে উলটে দিন। 'বেশি' হয়ে যাবে। আমরা সংখ্যায় অনেক বেশি কিনা!"

স্নেহময়বাবু এবার হাল্কা বিদ্রুপের সুরে বললেন, "তা বাপু, বেকারদের ভিড়ে নিজের নাম না লিখিয়ে কাজকর্ম তো কিছু করতে পারো। এই তো গালভড়িয়ে বললে পি.এইচ.ডি. করেছো।"

শিবে একটু আহত কণ্ঠে উত্তর দিলো, "ঠিকই বলেছেন স্যার। সারা পৃথিবীর চোখে শিক্ষিত চাকরিপ্রার্থীরা একটা ভিড় ছাড়া আর কিছু নয়। হাজার হাজার ব্যর্থ যুবকের ভিড়। আপনি ইতিহাস খুলে দেখে নিন, রেকর্ড চেক করুন। ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ার, সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার, গ্রেট ডিপ্রেশন, পার্টিশন, প্যান্ডেমিক – পৃথিবীতে যতবার বেকারত্বের বিপুল ঢেউ এসেছে, ততবার আমরা শুধু সরকারি খাতায় অবাঞ্ছিত পরিসংখ্যানমাত্র হয়ে থেকে গেছি। তার বেশি আর কিছু ভাবেনি কেউ।" কথাগুলো বলতে বলতে শিবের গলা ভারি হয়ে আসে। অল্প আলোতেও স্নেহময়বাবু বুঝতে পারেন তার চোয়াল শক্ত হয়ে এসেছে।

ইতিহাসের খবরাখবর রাখে ছেলেটা। তার কথায় যে বেশ ধার রয়েছে তা বুঝতে আর বাকি

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

থাকে না স্নেহময়বাবুর। তিনি জিজ্ঞেস করেন, "তা গবেষণা কি ইতিহাসেই?"

শিবে বলল, "না স্যার। ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র ছিলাম। তবে গবেষণার বিষয় জানতে চাইবেন না। সেসব প্রায় ভুলেই যেতে বসেছি। এখন শুধু অঙ্ক কষি। বাজারদরের হিসেব রাখি আর গুনতে থাকি প্রতিবছর আরো কত বেকার চাকরিপ্রার্থী বাড়ল। শেক্সপীয়র, মিল্টন, ডিকেন্স, জয়েস, এলিয়ট থেকে আমি এখন অনেকদূরে এসে গেছি স্যার।" এক নিশ্বাসে নামগুলো বলে থামল শিবে। তারপর আবার বলল, "আর তাছাড়া এখন আর সাহিত্য ফাহিত্য ভাল্লাগে না স্যার। ওসব বড়লোকি জিনিস। সুকান্ত'র কথাই ঠিক, 'ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়'। আচ্ছা, আপনার সাহিত্য, সিনেমা, শিল্প এগুলো কখনো আমাদের কথা বলে? আমরা মানে শিক্ষিত বেকারেরা সাহিত্যে কোথায়? সরকারি রেকর্ড বুকের বাইরে থেকে আমরা বেরোতে পারিনি স্যার। বলুন তো বেকারত্ব নিয়ে একটা ভালো উপন্যাস কে কবে লিখেছে? কিংবা একটা ভালো সিনেমা?"

অন্ধকারে চোখ চিকচিক করে উঠল শিবের। স্নেহময়বাবু চট করে তার কথার খুব একটা সদুত্তর দিতে পারলেন না। এই ছেলের প্রতিটি কথা প্রায় চাবুকের মত - তীব্র, সটান। তাঁর মত দুঁদে সংলাপ লিখিয়েকেও যেন চুপ করিয়ে দেয়। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "চাকরির পরীক্ষা-টরীক্ষা দিয়েছ কিছু?"

শিবে বলল, "আজকাল আর দিইনা স্যার। দু'বছর হল ছেড়ে দিয়েছি। তার আগে পর্যন্ত মোট বাইশটা পরীক্ষা দিয়েছি, প্রাইমারি, মাল্টিটাস্কিং, ক্লারিকাল, গ্রুপ ডি, সুইপার... কোনো কিছুই বাদ রাখিনি স্যার। কিন্তু না। কোথাও যোগ্যতা প্রমাণ করতে পারিনি।"

স্নেহময় সরকার এই চাকরির বাজার সম্পর্কে কখনোই খুব একটা মাথা ঘামাননি। কবে কিসের বিজ্ঞাপন বেরোল, কতজন প্রার্থী, কবে ইন্টারভিউ এইসব নিয়ে তাঁর ভাবার কারণ ঘটেনি কখনো। এখানকার মার-কাটারি প্রতিযোগিতা, এক নম্বরের জন্য লক্ষজনের জীবনমরণ লড়াই - এসব তাঁর অবিদিত। তাঁর জগৎ মূলত বিনোদনমূলক - খাদ্যমেলা, বইমেলা, সাংস্কৃতিক মেলা এইসব। বেকারত্ব তাঁর এই চেনাছকের বাইরের সম্পূর্ণ অপিরিচিত এক বিষয়। তাই শিবের প্রতি তাঁর তেমন সহানুভুতি জাগল না। বরং উল্টে তাঁর মনে হতে থাকল, এত পরীক্ষা দিয়েও কৃতকার্য হয়নি যে ছেলে তার কোনদিনই কিছু হবার নয়। এদিকে ডিগ্রী ডক্টরেট, অথচ ঝাঁট দেবার চাকরির ইন্টারভিউ পাশ করে না। স্নেহময়বাবুর এবারে শিবের জ্ঞানের গভীরতা নিয়ে সন্দেহ জাগল। একটু হতাশই হলেন তিনি; প্রথমদিকে ছেলেটার চটকদার কথায় কিছুটা ভালো লেগেছিল তাঁর। আর এখন সেটুকুও...

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

এবার তিনি বেশ একটা উপদেশ দেবার ভঙ্গিতেই শিবেকে বললেন, "মাত্র কয়েকটা পরীক্ষা দিয়েই হাল ছেড়ে দিলে বুঝি? চেষ্টা না করে মরাকান্না কাঁদলে কি কিছু হবে?"

শিবে সঙ্গে সঙ্গে সে কথার উত্তর দিলো না। একটুক্ষণ থেমে তারপর ক্ষীণ, অবসন্ন গলায় বলতে শুরু করল, "মাত্র বাইশটা পরীক্ষা স্যার। বাইশটা ব্যর্থতা। বাইশবার হাল ছেড়ে দিয়ে আবার উঠে দাঁড়ানো। তারপর আর পারিনি স্যার। তবে এই মাত্র বাইশটা পরীক্ষার আগেও জীবন অনেক পরীক্ষা নিয়েছে স্যার। এগুলোর থেকেও আরো অনেক কঠিন পরীক্ষা। জ্ঞান হবার পর থেকেই ভাতের পাশে কখনো একটার বেশি দু'টো তরকারি দেখিনি। বাবাকে হারাই ক্লাস সেভেনে। ক্লাস টুয়েলভ থেকে টিউশন পড়িয়ে মাকে সাহায্য করতাম। নিজের পড়ার খরচ জোগাড় করতাম। তারপর কোভিডের সময় ভালো চিকিৎসার অভাবে মা'কেও হারাই। টিউশনের টাকা বাঁচিয়ে ফর্ম ফিলাপ করি, চাকরির পরীক্ষা দিই। একটা পরীক্ষায় পাশও করি। কিন্তু আইনি জটিলতায় সেটাও আটকে যায়। এই শহরে এসেছি দু'বছর। কর্মতলায় চাকরির দিনের বেলা দাবীতে ধর্নায় বসি, রাতে হোটেলে কাজ করে খাবার টাকা জোগাড় করি। ফর্ম ফিলাপের টাকা থাকে না স্যার।"

এক নাগাড়ে এতটা বলে একটু হাঁপিয়ে উঠেছে শিবে। স্নেহময়বাবু বুঝলেন, দু'তিন দিনের অনাহারে ছেলেটার শরীর বেশ দুর্বল হয়ে আছে। তিনিও আর কোনো কথা বললেন না।

সন্ধ্যার স্তব্ধতা পার্কজুড়ে যেন এক নরম চাদরের মতো বিছিয়ে পড়েছে। গাছের পাতাগুলো বাতাসের অভাবে স্থির, শুধু মাঝে মাঝে কোনো শুকনো পাতা মাটিতে পড়ার মৃদু শব্দ শোনা যাচ্ছে। মাত্র মিনিট কুড়ি আগে যা একটা রোমাঞ্চকর চিত্রনাট্য হিসেবে দেখা দিয়েছিল, তা এখন একটি যুবকের ব্যর্থতার রূপকথা হয়ে সারা পার্কের বাতাসকে মূহূর্তে বিষন্ন করে তুলল।

ফর্ম ফিলাপের কথা শুনে স্নেহময়বাবুর সহসা সুজয়ের কথা মনে পড়ল। সুজয় তাঁর বাড়ির পরিচারিকা দোলনদি'র ছেলে। স্ত্রী কল্পনাদেবীর মুখে শুনেছেন ছেলেটা নাকি বুদ্ধিমান, পড়াশোনায় ভালো। বি.এ বা এম.এ ঐরকম কিছু একটা পাশ করেছে। স্নেহময়বাবুর মনে পড়ল মাসদুয়েক আগে একদিন সকাল সকাল কোনো একটা জরুরি কাজে বেরোনোর আগে কল্পনাদেবী বলেছিলেন, "আমাকে পনেরোশো টাকা দিতে পারবে? দোলনদি কাল চেয়েছিল। বলল খুব নাকি দরকার। ওর ছেলে কি একটা পরীক্ষার ফর্ম ফিলাপ করবে।" স্নেহময়বাবু সেকথায় পাত্তা না দিয়ে বলেছিলেন, "ওসব পরে হবে ক্ষণ। ঠিক বেরোবার সময়েই তোমার এইসব লেগে থাকে।"

স্নেহময়বাবুর ঘোর ভাঙল শিবের কথায়, "আপনাদের সাহিত্য, সংস্কৃতিতে আমাদের এ

Scanned with OKEN Scanner

লড়াই এর কোনো মূল্য আছে স্যার?" পুরনো কথার জের ধরে আবার শিবে বলল, "বেকার ছেলের মাটি কামড়ে পড়ে থাকার সংগ্রাম নিয়ে লেখা হয়েছে এরকম একটা সচেতন উপন্যাসের নাম বলবেন স্যার, কিংবা কোনো সিনেমা?"

প্রশ্নটা এই নিয়ে দ্বিতীয়বার করল শিবে। এবার স্নেহময় বাবু তৈরি ছিলেন মোক্ষম জবাব দেবার জন্য। বেশ গাম্ভীর্যের সাথে বললেন, "সত্যজিৎ রায়ের নাম শুনেছ? *প্রতিদ্বন্দ্বী* ছবিটা দেখে নিও।"

শিবে উৎসাহিত হয়ে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর দিল, "অনেকবার দেখেছি স্যার। সত্যজিৎ, মৃণাল, ঋত্বিক আমার প্রিয়। *জনঅরণ্য, মেঘে ঢাকা তারা, কলকাতা ৭১...* ব্যাস ওটুকুই। কিন্তু তারপর... আশির দশক, নব্বই এর দশক, এখন? সেরকম দরদ দিয়ে ক'জন ভেবেছে আমাদের কথা? ক'জন লেখক আমাদের এই পাঁচশো দিনের ত্যাগের কথা লিখছে স্যার?"

স্নেহময়বাবু আবার যারপরনাই অবাক হয়ে তাকালেন শিবের দিকে। কথাবার্তায় এ ছেলে ক্ষুরধার। সিনেমার খবর দিব্যি রেখেছে! আর কী কী ব্যাপারে খবর রাখে কে জানে? নাকি পুরোটাই ঐ চটকদারি কথার ছল!

স্নেহবাবুর এবার সত্যি সত্যি ভীষণ রাগ হলো। চাইতে এসেছো তো একটা কাজ, তাতে আবার ধান ভানতে শিবের গীত কেন? এইসব উপন্যাস, সিনেমা করার দরকার কী? তাছাড়া তাঁর মতো একজন এত বড় লেখকের মুখের উপর বাংলা উপন্যাসের এমন অক্ষমতার কথা বলে কোন সাহসে! তার লড়াই এর গল্প শুনে একটু হলেও সহানুভূতি এসেছিল তাঁর মনে। কিন্তু এসব শোনার পর তার আর ছিটেফোটাও অবশিষ্ট রইল না।

গলায় একরাশ বিরক্তি নিয়ে এসে বললেন সরকারবাবু, "তা বাপু, এসব তত্ত্বকথা না কপচিয়ে, একটু অন্য কিছু কাজের চেষ্টা করলেই তো পারো। সবসময় সরকারি চাকরির পেছনে না ছুটে একটু চা বা চপের দোকানও তো দিতে পারো, কিংবা ঝালমুড়ি..."

সরকারের মুখে এ হেন কথা শুনে বেদনাহত হয়ে তাকাল শিক্ষিত বেকার ওরফে শিবে। তারপর আবার বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর সে অনেকটা স্বগতোক্তির মত বলল, "আমরা আসলে একটা পচে যাওয়া সিস্টেমের ভিকটিম স্যার। জানেন, সুইপারের ইন্টারভিউতে আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল, এই পৃথিবীতে মোট কত কিলোগ্রাম ধুলো আছে। জ্ঞান এখানে অর্থহীন। অর্থই এখানে অর্থবহ। সব কিছু জানতেও হবে, কিন্তু সে জানার কোনো ফল নেই।"

একটা হেরে যাওয়া আধমরা শিক্ষিত বেকারের মুখে এত জ্ঞানের কথা শুনতে আর ভালো লাগছিলো না স্নেহময়বাবুর। বিশেষ করে বাংলা উপন্যাস নিয়ে বক্র মন্তব্য করে ছেলেটা তাঁর ইগো

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

হার্ট করেছে। আর তাছাড়া নিজের অপারগতার দায় সিস্টেমের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া লোকেদের তিনি ঘৃনা করেন। আচমকা স্নেহময়বাবুর নিজেকে একজন বদমেজাজি ইন্টারভিউয়ার মনে হল। তিনি একেবারে তলিয়ে দেখে নিতে চান ওর জ্ঞানের কত দৌড়।

জোরালো কণ্ঠে তিনি বলে উঠলেন, "এই ছেলে, বলো তো দেখি..."

আকস্মিক স্নেহময়বাবুর কণ্ঠস্বরের এমন পরিবর্তনে চমকে উঠল শিবে। তারপর ক্লান্ত শরীরটা টান টান করে নিল সে। প্রথম সন্ধ্যের নিঝুম অন্ধকারে আর নীরবার মাঝে শুন্য পার্কখানা একটা মহানাটকের ক্লাইম্যাক্সের জন্য তৈরি হয়ে উঠল যেন।

—বিগ ব্যাং থিওরি জানা আছে?

—বিগ ব্যাং তত্ত্ব হলো মহাবিশ্বের সৃষ্টি সম্পর্কিত একটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব, যা অনুযায়ী প্রায় ১৩.৮ বিলিয়ন বছর আগে মহাবিশ্ব একটি অতি ঘন এবং অতি উত্তপ্ত বিন্দু অর্থাৎ সিঙ্গুলারিটি থেকে বিস্ফোরণের মাধ্যমে প্রসারিত হয়েছিল। এই বিস্ফোরণ থেকেই সময়, স্থান, শক্তি, এবং পদার্থের সূচনা হয়।

—কোন প্রাচীন সভ্যতা প্রথম ডাক ব্যবস্থা আবিষ্কার করেছিল?

—পারসিক সাম্রাজ্য, সাইরাস দ্য গ্রেট-এর অধীনে।

—কোন মরুভূমি "মৃত্যুর সাগর" নামে পরিচিত?

—চীনের তাকলামাকান মরুভূমি।

—পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন জীবন্ত গাছ কোন প্রজাতির?

—মিথুসেলাহ, ক্যালিফোর্নিয়ার একটি ব্রিস্টলকোন পাইন, যার বয়স ৪৮০০ বছরের বেশি।

—গ্রীসের উপকূলে একটি জাহাজের ধ্বংসাবশেষ থেকে আবিষ্কৃত অ্যান্টিকাইথেরা যন্ত্রটির মূল উদ্দেশ্য কী ছিল?

—এটি একটি প্রাচীন এনালগ কম্পিউটার, যা জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক অবস্থান এবং গ্রহণের ভবিষ্যদ্বাণী করতে ব্যবহৃত হতো।

কেমন যেন রোখ চেপে যায় স্নেহময়বাবুর মাথায়। একটা নিরেট বেকার এভাবে তাঁকে হারিয়ে দেবে, এটা কিছুতেই মেনে নিতে পারেন না তিনি। দম নেবার জন্য একটু থামেন তারপর আবার একের পর এক প্রশ্ন করতে থাকেন পাগলের মত। তাঁর গতির সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে হাঁপিয়ে উঠছিল শিবে। তবুও তাকে সব প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। একটাও ভুল হওয়া চলবে না...

এখন আওয়াজ বলতে শুধু ঝিঁঝিঁর ডাক। তাকে ছাপিয়ে ছুটতে থাকলো স্নেহময়বাবুর

Scanned with OKEN Scanner

প্রশ্নবাণ। আর সব প্রশ্নের এক এক কর উত্তর দিতে থাকলো শিবে।

—মাল্টিভার্স

—স্ট্রিং থিওরি

—কোয়ান্টাম মেকানিক্স

—অ্যান্টন শেকভ

—পিরামিড

—পরজন্ম...

—পরজন্ম...

—পরজন্ম...

শিবের কোনো সাড়া নেই। "এই শিবে, পরজন্মের তত্ত্ব বলো। শিবে, এই শিবে..."

স্নেহময়বাবু এবার থামলেন। তেষ্টায় গলা শুকিয়ে কাঠ। কাঁধঝোলা ব্যাগ থেকে জলের বোতলখানা বের করে ঢকঢক করে আকণ্ঠ জল খেলেন তিনি। তারপর, পায়ের কাছে বসে থাকা শিবের কাঁধ ধরে আলতো ঠেলা দিতেই বেঞ্চের পায়ার কাছে ধপ করে লুটিয়ে পড়ল শিবের অবসন্ন দেহ।

কিছুক্ষণ আর কোনো শব্দ নেই। সব চুপচাপ। রোশন সিং এর গান থেমেছে অনেকক্ষণ। কেবল দূরে কোনো একটা গাছের ডাল থেকে অকারণে চেঁচিয়ে উঠল একটা লক্ষীপেঁচা। ছেলেটা মরে গেল নাকি?

না, মরেনি। অজ্ঞান হয়েছে কেবল। নাকের কাছে হাত দিয়ে দেখলেন স্নেহময়বাবু। নিশ্বাস চলছে। এবার তিনি কাঁপা কাঁপা হাতে বোতল থেকে একটু জল নিয়ে ছিটিয়ে দিলেন শিবের চোখেমুখে। জ্ঞান ফিরলো ছেলেটার, তারপর ধীরে ধীরে উঠে স্নেহময়বাবুর সামনে দাঁড়াল সেই আগের ভঙ্গিমায় ঠিক যেভাবে প্রথমেই এখানে এসে দাঁড়িয়েছিল সে। হাতদুটো সামনে কোমরের কাছে এনে জড়ো করে শিবে এবার আগের থেকে অনেক স্পষ্ট আর দৃপ্ত গলায় বলে উঠল, "আমাকে একটা সুযোগ দিন স্যার।"

চমকে উঠলেন স্নেহময়বাবু। এ কি শিবের কণ্ঠ, নাকি অন্য কারো?

পুরনো ফোয়ারার জমা জলে টুপ করে একটা ব্যাং লাফিয়ে পড়ল। পার্কের নিটোল নিস্তব্ধতা আর অন্ধকার একসাথে দলা পাকিয়ে চারদিক থেকে ছুটে এল স্নেহময়বাবুর দিকে। কোথাও এতটুকু বাতাস নেই, অথচ স্নেহময়বাবুর মনে হল, যেন পার্কের সব দোলনাগুলো দুলে

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

উঠল একসাথে।

একটা অজানা ভয়ে এবার শীত শীত করে উঠল তাঁকে। এমনি সময় সেই একইরকম দৃঢ় অথচ ঠাণ্ডা গলায় শিবে বলল, "আমাকে চিনতে পারছেন না? আমি অমিত স্যার, আপনার নতুন উপন্যাসের না হয়ে ওঠা চরিত্র।"

অমিত! নামটা শুনে আঁতকে উঠলেন স্নেহময়বাবু। অমিত তাঁর নতুন উপন্যাসের তৃতীয় চরিত্র, যা নিয়ে ভেবে ভেবে কিছুই কুলকিনারা পাননি তিনি। ত্রিকোণ প্রেমের একটা কোণ হিসেবে অমিতকে ভেবেছিলেন তিনি। অমিত একটি ব্যর্থ চরিত্র, লক্ষ্যভ্রষ্ট, অপদার্থ। কিছুক্ষণ গল্পের মধ্যে তাকে রেখে দুর্ঘটনায় মেরে দিয়ে তার পার্ট শেষ করে দেবেন ভেবেছিলেন, যাতে বাকি দুই-চরিত্রের মিলন সম্ভব হয়। কিন্তু তার সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থান ঠিক না করতে পেরে তিনি কিছুতেই চরিত্রটিকে ডেভেলপ করে উঠতে পারছিলেন না। তাই অনেক ভাবার পরেও তিনি চরিত্রটিকে বাতিল করেন।

স্নেহময়বাবুর মনে পড়ল, তাঁর লেখার টেবিলের নীচে রাখা ওয়েস্টপেপার বক্সের মধ্যে বাতিল হয়ে পড়ে আছে অমিত। একটি নিহত চরিত্র।

কিন্তু এও কি সম্ভব! তাঁর এ উপন্যাসের প্লটের কথা কেউ জানেনা। কল্পনাদেবীও না। তাহলে শিবে কীভাবে জানল? স্নেহময়বাবু নিজেকে প্রশ্ন করেন, চিমটি কেটে দেখেন। না স্বপ্ন নয়, তাঁর চোখের সামনে জলজ্যান্ত দাঁড়িয়ে আছে তাঁরই হাতে খুন হয়ে যাওয়া সম্ভাবনাময় একটি চরিত্র অমিত। আতঙ্কে বেঞ্চ ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন তিনি।

স্নেহময়বাবু সামনে তাকিয়ে যা দেখলেন তাতে তাঁর শিড়দাঁড়া বেয়ে একটা ঠান্ডা স্রোত বয়ে গেলো। দেখলেন মূহুর্তের মধ্যে পাল্টে যাচ্ছে অমিতের মুখ। একটা, দুটো, তিনটে, চারটে - মুখের পর মুখ, সব রোগা, না খেতে পাওয়া, অবসন্ন ছেলেমেয়েদের মুখ। আর প্রত্যেক মুখ রাতের নীরবতাকে ভেদ করে দিয়ে চিৎকার করে বলছে, "আমাকে একটা একটা সুযোগ দিন। এই যে আমি, একজন শিক্ষিত বেকার, আমি আপনার গল্পের দুর্দান্ত নায়ক হতে পারি। আমাকে সুযোগ দিন স্যার। আমি দেখিয়ে দেব, কিভাবে সব বাধা পেরিয়ে নায়ক হয়ে উঠতে পারি আমি। শুধু একটা সুযোগ..."

আর কিছু ভাবতে পারলেন না স্নেহময়বাবু। ধপ করে বসে পড়লেন বেঞ্চে। শুধু অজ্ঞান হয়ে যাবার আগে হাল্কা শুনতে পেলেন, শিক্ষিত বেকার ওরফে শিবে ওরফে অমিত জ্বলন্ত চোখে তাঁর দিকে তাকিয়ে বলছে, "অনেক অনুরোধ করেছি স্যার। এবার আর অনুরোধ নয়। আপনি জিজ্ঞেস করছিলেন না, পরজন্মের তত্ত্ব? এবার নিজেই গিয়ে দেখে আসুন পরজন্ম কেমন।" বলেই সে

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

পেছনের পকেট থেকে একটা ধারালো চুরি বের করে ঝাঁপিয়ে পড়ল স্নেহময়বাবুর বুকের উপর।

স্নেহময়বাবুর মুর্ছিত দেহ লুটিয়ে পড়ল বেঞ্চের উপর।

"বাবু, ও বাবু...বাবু...উঠিয়ে..." অবাঙালি কণ্ঠের ডাক।

সরকারবাবুর ঘুম ভাঙ্গল, কিংবা ভাঙল কি?

চোখ কচলে তিনি সামনে তাকিয়ে দেখলেন সদাহাস্যময় রোশন সিং দাঁড়িয়ে। হাতের খৈনিটা মুখে পুরে দিয়ে সে বলল, "বাবু সো গ্যয়ে থে কিয়া? সাড়ে ছয় বাজ গয়ে..."

৩.

পরদিন সকাল। স্নেহময়বাবু ধোঁয়া ওঠা এক পেয়ালা চায়ে চুমুক দিতে দিতে কল্পনাদেবীকে বললেন, "আজ একবার দোলনদিকে বোলো তো ওর ছেলেটাকে যেন বিকেলে আমার কাছে পাঠায়। কী যেন নাম ছেলেটার?"

কল্পনাদেবী বললেন, "সুজয়। কেন, তাকে দিয়ে কী হবে?"

স্নেহময়বাবু সে কথার কোনো উত্তর না দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "ছেলেটা কেমন গো?"

কল্পনাদেবী বললেন, "খুব ভালো ছেলে। পাড়ার সেরা ছেলে। এম.এ. পাশ করেছে গতবছর। এখন চাকরির চেষ্টা চালাচ্ছে। এই তো সেদিন, বাজারে দেখা হল আমার সাথে। কেন কি হয়েছে বলবে তো।"

স্নেহময় বাবু কিছু না বলে চুপচাপ গরম চায়ে চুমুক দিতে লাগলেন।

বিকেল চারটের দিকে সুজয় এলো দেখা করতে। মাঝারি উচ্চতার, বেশ স্মার্ট মুখের একটা সপ্রতিভ ছেলে, যাকে দেখলেই মন ভালো হয়ে যায়।

স্নেহময়বাবু জিজ্ঞেস করলেন, "তুই এখন কী করিস যেন?"

ছেলেটি উত্তর দিল - "কম্পিটিটিভের প্রিপারেশন নিচ্ছি কাকু।"

—কোন ফিল্ডে যেতে চাস?

—বি.সি.এস।

—আচ্ছা। কোচিং নিস নাকি কোথাও?

Scanned with OKEN Scanner

—না না, কোচিং নেবার মত পরিস্থিতি নেই কাকু। মায়ের উপর আরো অনেক চাপ বেড়ে যাবে।

—নিজে নিজে পড়লে হবে? কোথাও ঘাটতি থাকবে না?

—যদি ভালো স্টাডি মেটেরিয়াল থাকে তাহলে একটু বেশি খাটলেই...

—তোর ভালো বই কিছু আছে?

প্রশ্ন শুনে সুজয় মুখ নামিয়ে রাখল। স্নেহময়বাবু বুঝলেন, নেই।

—পরীক্ষা কবে?

—সামনের মার্চে প্রিলিমস।

—ফর্ম ফিলাপ হয়ে গেছে?

—না কাকু, এই ডিসেম্বরে।

—কত টাকা লাগে?

—ঠিক জানি না। এবারই প্রথম দেবো তো। মনে হয় হাজার টাকা।

স্নেহময়বাবু আর কোনো কথা না বলে সামনের টেবিলে রাখা মানিব্যাগ খুলে দুটো পাঁচশো টাকার নোট বের করে সুজয়ের হাতে দিয়ে বললেন, "আরো যদি কোনো পরীক্ষায় ফর্ম ফিলাপ করিস আমাকে জানাস। আমি টাকা দিয়ে দেব। আর হ্যাঁ, কাল বিকেল পাঁচটা নাগাদ একবার বুক-হাউসে আসিস। আমি থাকবো। তোর যা যা বই দরকার কাল ওখান থেকে নিয়ে নিস।"

সুজয় কিছু বুঝতে না পেরে কিছুক্ষণ তাঁর দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল। তারপর সবিত ফিরে পেতে, সে ঢিপ করে একটা প্রণাম করলো স্নেহময়বাবুকে। কৃতজ্ঞতায় সুজয়ের চোখ ভরে জল এসে গেছে।

সুজয় চলে যাবার পর তিনি দেহ টানটান করে তাঁর ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে দিলেন। হাতে এখন বিশেষ কাজ নেই তাঁর। সামনেই তাঁর লেখার টেবিলের উপর পড়ে আছে কয়েকটা বাতিল কাগজ। গতকাল রাত্রে শোবার আগে তিনি তাঁর ত্রিকোণ প্রেমের কাহিনিকে লাল কালি দিয়ে কেটে দিয়েছেন। আজ বহুকাল পর বইমেলায় স্নেহময় সরকারের কোনো উপন্যাস প্রকাশিত হবে না।

৪.

মাসচারেক পর। স্নেহময়বাবু তাঁর কাজের ঘরে বসে একটা ইংরেজি নাটক পড়ছিলেন। সকালবেলা। এমন সময় দোলনদি পর্দা ঠেলে ঘরে ঢুকে বলল, "দাদাবাবু, ছেলেটা তোমার সঙ্গে

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

একবার দেখা করতে এসেছে।"

কথা শেষ হতে না হতেই সুজয় এসে ঢুকল ঘরের ভিতর। হাতে একটা প্রিন্টেড কাগজ। তাকে দেখে স্নেহময়বাবুর মন ভালো হয়ে গেল। বললেন, "কি রে, কেমন আছিস?" সেই যে গেছিস তারপর তো আর দেখাই করিস নি।

সুজয়ের বদলে দোলনদি এই প্রশ্নের উত্তর দিল, "আর বোলো না গো দাদাবাবু। সেই থেকে ছেলে তোমার দেওয়া বইগুলো মুখে নিয়ে বসে ছিল। শুধু চান খাওয়া বাদে সর্বদাই। বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে অবধি দেখা করে নি এই ক'টা মাস।"

এবার সুজয় বলল, "প্রিলিমস এর রেজাল্ট বেরিয়েছে কাকু। তাই আপনাকে দেখাতে নিয়ে এলাম।"

স্নেহময়বাবু বেশ আগ্রহের সুরে বললেন, "কই দেখি, কেমন হয়েছে রেজাল্ট।"

হাতের কাগজটা ওনার দিকে বাড়িয়ে দিতে দিতে সুজয় বলল, "এবারে জেনারেল কাট-অফ ছিল একশো আঠাশ। আর আমার এসেছে একশো বাইশ। জিওগ্রাফির পোর্শনটা সেরকম দেখে যেতে পারিনি এবার।"

খুব আফসোস হল স্নেহময়বাবুর। বললেন, "ইস, মাত্র ছয় নম্বরের জন্য কেটে গেল!"

কিন্তু স্নেহময় বাবু দেখলেন, সুজয়ের চোখে আফসোসের বা দুঃখের কোনো চিহ্নমাত্র নেই। বরং তার চোখদুটো স্বপ্নে ভরপুর। অদম্য জেদ আর আশার আলো ঝিলিক দিয়ে গেল সুজয়ের তরুণ চোখের দৃষ্টিতে। সে বলল, "এবারে না হোক পরের বারে ঠিক হয়ে যাবে কাকু। পড়ার টাইমটা আর একঘন্টা বাড়িয়ে দেব আজ থেকে।"

আর কিছু বললেন না স্নেহময়বাবু। তিনি জানেন, এ ছেলে পারবে।

সেদিন রাতে, খাওয়া দাওয়ার পর লেখার টেবিলে বসে নতুন এক দিস্তা ফুলস্কেপ কাগজ বের করে নিয়ে লিখতে বসলেন স্বনামধন্য লেখক স্নেহময় সরকার। প্রথম পাতায় বড় বড় করে লিখলেন তাঁর নতুন উপন্যাসের নাম – *সুজয়* ।

****

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

আঞ্চলিক ইতিহাসে কেশবপুর গ্রাম

ড. সেক আবুল
অধ্যাপক ইতিহাস বিভাগ

হুগলি জেলার আরামবাগ মহকুমা ও আরামবাগ ব্লকের একটি উন্নত জনবহুল গ্রাম হলো কেশবপুর।
আয়তন: ৩,১৪৯.৫ একর বা ১২৭৫.১০ হেক্টর বা ১২.৭৫ বর্গ কিমি।
চতুঃসীমা:

- উত্তরে: আরামবাগ ব্লকের অধীন মলয়পুর-১
- দক্ষিণে: হরিণখোলা-১
- পশ্চিমে: বাতানল গ্রাম পঞ্চায়েত
- পূর্বে: পুরশুড়া ব্লক

জনসংখ্যা (২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী):

- মোট: ১৬,১৪১ জন
- মুসলিম: ৩৫%
- হিন্দু: ৬৫%
- মহিলার সংখ্যা: ৭,৮৪৩ জন
- পুরুষের সংখ্যা: ৮,২৯৮ জন
- মোট পরিবার: ৩,৫৪৩টি
- প্রতি পরিবারে গড় জনসংখ্যা: ৫.২ জন
- তপশিলী জাতি: ৫,৫৪৭ জন
- মহিলা: ২,৭২৬ জন
- পুরুষ: ২,৮২১ জন
- বিপিএল (দারিদ্র্যসীমার নিচে) জনসংখ্যা: ৪,৪৬১ জন
- ০-৬ বছর বয়সী শিশুর সংখ্যা: ১,৮৯২ জন
- মেয়ে শিশু: ৯১৭ জন
- ছেলে শিশু: ৯৭৫ জন

শিক্ষা:

স্বাক্ষর জনসংখ্যা: ১১,১৬৬ জন

- মহিলা: ৪,৯১৭ জন
- পুরুষ: ৬,২৪৯ জন
- নিরক্ষর জনসংখ্যা: ৪,৯৭৫ জন

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

- মহিলা: ২,৯২৬ জন
- পুরুষ: ২,০৪৯ জন
    - স্বাক্ষরতার হার: ৬৯.১৮%
- মহিলা: ৬২.৬৯%
- পুরুষ: ৭৫.৩১%
- নারী-পুরুষ অনুপাত: ৪৯:৫১
- বার্ষিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার: ২.৩৯%

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান:

- প্রাথমিক বিদ্যালয়: ১৩টি
- মাধ্যমিক বিদ্যালয়: ২টি
- উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়: ১টি
- কলেজ: ১টি
- প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়: ১টি
- শিশু শিক্ষা কেন্দ্র: ১টি
- আইসিডিএস (ICDS): ২৬টি

অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ও সুবিধা:

- গ্রামীণ গ্রন্থাগার: ১টি
- প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র: ১টি
- উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র: ৩টি
- প্রাণী চিকিৎসা কেন্দ্র: ১টি
- গভীর নলকূপ: ৩টি
- নলকূপ: ২৪৬টি
- পিএইচই (PHE): ২টি
- কৃষি সমবায় সমিতি: ১টি
- হাট-বাজার: ১টি
- নদী সেচ প্রকল্প: ৭টি
- ডাকঘর: ১টি
- ক্লাব: ২টি
- রেশন দোকান: ৪টি
- SASPFUW (স্বনির্ভর সংস্থা): ২১২টি
- গ্রামীণ ব্যাংক: ১টি

তথ্যসূত্র:

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

- সেনসাস -২০১১
- মলয়পুর-২ গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস
- অঞ্চল প্রধান: আরেফা বেগম সেক (স্বামী: সেক আব্দুল মালেক)

সাক্ষাৎকার: সেক আলাউদ্দিন (০৭-১১-২০২৪

কেশবপুর গ্রামে মাদ্রাসার ইতিহাস

কেশবপুর গ্রামে রয়েছে একটি ঐতিহ্যবাহী মাদ্রাসা। ১৯২৯ সালে সম্ভ্রান্ত পরিবারের সদস্য মির্জা আব্দুর রশিদ সাহেবের উদ্যোগে মাদ্রাসাটি গড়ে ওঠে, যা বর্তমানে **কেশবপুর জুনিয়ার হাই মাদ্রাসা** নামে পরিচিত। এটি গ্রামের মাঝখানে স্থাপিত হয়। মাদ্রাসার ছাত্রদের খেলাধুলার জন্য এবং প্রতিষ্ঠানের পরিকাঠামো উন্নত করতে শেখ সাফিউদ্দিন, মির্জা আবিদ আলি, সেক নাসির সাহেব ও সাইদুর সাহেব যৌথ উদ্যোগে জমি দান করেন। এছাড়াও, বহু গুণীজনের সক্রিয় ভূমিকা এই প্রতিষ্ঠানকে সমৃদ্ধ করেছে।

গ্রামের প্রথম গ্রাজুয়েট ছিলেন শেখ ফকির উদ্দিন (ফোকা সাহেব)। মাদ্রাসার শুরুর দিকের উল্লেখযোগ্য ছাত্রদের মধ্যে রয়েছেন:

১) অজিত মালিক (প্রাক্তন আই.আর.এস. অফিসার)
২) সেক মহম্মদ আলি (প্রাক্তন কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারী)
৩) শেখ নুর মহম্মদ হক (প্রাক্তন রাইটার্স বিল্ডিং অফিসার)
৪) কাজী আইনাল হক (প্রাক্তন প্রাথমিক শিক্ষক, বর্তমানে ১০০ বছর বয়সেও জীবিত)
৫) মির্জা গোলাম রহমান (প্রাক্তন প্রাথমিক শিক্ষক)
৬) হাসিম আলি মল্লিক (প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক)
৭) শেখ ইদ্রিস আলি (প্রাক্তন শিক্ষক)
৮) শেখ ফিরোজ আহমেদ (প্রাক্তন আই.আর.এস. অফিসার)
৯) মির্জা আব্দুল মাবুদ (প্রাক্তন শিক্ষক)
১০) শেখ ইকবাল হোসেন (প্রাক্তন শিক্ষক)
১১) শাহ শাহাদাত হোসেন (প্রাক্তন ক্যালকাটা মাদ্রাসার শিক্ষক, বর্তমানে কলকাতা জি.ডি. সার্কেলে কর্মরত)
১২) মির্জা আব্দুল হামিদ
১৩) সেক নাসিম আহমেদ (বর্তমান প্রাথমিক শিক্ষক)

গ্রামের প্রথম মুসলিম উচ্চশিক্ষিতা মহিলা ছিলেন বিলকিস বেগম। স্বাধীনতা আন্দোলনে সক্রিয় ছিলেন মির্জা আব্দুর রশিদ ও বেলায়েত হোসেন মল্লিক। জেলার স্বাধীনতা আন্দোলন ও বিপ্লবী কার্যকলাপে মির্জা আব্দুর রশিদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এই অঞ্চলে নৈতিক শিক্ষা ও ইসলামী সংস্কৃতি বিকাশে খন্দকার আব্দুল কাদেরের অবদান অপরিসীম।

গ্রামে অবস্থিত **মসজিদ তলা** এলাকার একটি প্রাচীন মসজিদ প্রায় ১৫০ বছর আগে নির্মিত হয়।

২০১০ সালে **কেশবপুর জুনিয়ার হাই মাদ্রাসা** থেকে এটি **কেশবপুর হাই স্কুল**-এ রূপান্তরিত হয়। বর্তমানে এই স্কুলে

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

উচ্চমাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত আরবি বিষয় পড়ানো হয়। বহু কৃতি ছাত্র এই প্রতিষ্ঠানের গর্ব, যারা আজ দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে যুক্ত রয়েছেন।

তথ্যসূত্র:

- শেখ নাসিম আহমেদ (শিক্ষক, বর্তমান কেশবপুর জুনিয়ার হাই মাদ্রাসার প্রাইমারি সেকশন, সাক্ষাৎকার: ০৯-১১-২০২৪)
- মির্জা আব্দুল হামিদ (বর্তমান বয়স: ৮৩ বছর, সাক্ষাৎকার: ১১-১১-২০২৪)

কেশবপুর গ্রাম: ইতিহাস, শিক্ষা ও সংস্কৃতি

মুণ্ডেশ্বরী নদীর দুই তীরে বিস্তৃত কেশবপুর গ্রাম, যেখানে হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায় সম্প্রীতির সাথে বসবাস করেন। নদীর পশ্চিম তীরে রয়েছে গ্রাম পঞ্চায়েতের কার্যালয়, ভবতারণ উচ্চ ইংরেজি বালিকা বিদ্যালয়, সাব-পোস্ট অফিস, সাধারণ পাঠাগার এবং মতিবালা প্রাথমিক বিদ্যালয়। পূর্ব তীরে অবস্থিত একটি জুনিয়র হাই মাদ্রাসা, প্রাথমিক বিদ্যালয়, দুটি মসজিদ ও একটি ঈদগাহ।

কেশবপুর মহেন্দ্র ইনস্টিটিউট

কেশবপুর মহেন্দ্র ইনস্টিটিউট আরামবাগ ব্লকের অন্যতম প্রাচীন এবং শীর্ষস্থানীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। এটি ২ ফেব্রুয়ারি ১৯৪২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। তৎকালীন জমিদার এবং বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ভবতারণ সিংহ এই প্রতিষ্ঠানটি স্থাপন করেন। ২০১৭ সালে এটি প্রতিষ্ঠার ৭৫ বছর পূর্তি উদযাপন করে। এই প্রতিষ্ঠানের স্বনামধন্য ছাত্রদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন ড. গোবিন্দ লাল বসু, যিনি আইআইটি দিল্লির অধ্যাপক ছিলেন।

জমিদার ললিত মোহন সিংহ এবং তার অবদান

কেশবপুর, গৌরহাটি ও কৃষ্ণপুর চক্রের জমিদার ললিত মোহন সিংহ বর্ধমান মহারাজের পত্তনিদার ছিলেন। তার অবদান এই গ্রামে এখনও দেখা যায়। কেশবপুরের কালীমন্দিরের তত্ত্বাবধানে তার ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

আচার্য বংশের খ্যাতি

কেশবপুর গ্রামে আচার্য বংশের খ্যাতি অনেক। মৃত্যুঞ্জয় আচার্য ছিলেন জ্যোতিষ শাস্ত্রে পারদর্শী এবং বর্ধমান মহারাজ কর্তৃক 'সরস্বতী' উপাধি প্রাপ্ত। তার বংশধর সুধীর কুমার আচার্যের বাড়িতে রয়েছে ১৮২৮ শকাব্দে রচিত পঞ্জিকা এবং বাংলা ১৩২০ সালে রচিত আরেকটি পঞ্জিকা।

মদনমোহন ব্যানার্জি: কবিয়াল

গ্রামের আরেক গর্ব মদনমোহন ব্যানার্জি, একজন বিখ্যাত কবিয়াল। তার জন্ম ১৮৯০-১৯০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে। ভোলা ময়রার সমসাময়িক এই কবি প্রায়শই তার প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে কবি গানের আসরে অংশগ্রহণ করতেন।

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

ভবতারণ সিংহের অবদান

ভবতারণ সিংহ ছিলেন একজন বিশিষ্ট সমাজসেবী। তার দানে মতিবালা বালিকা বিদ্যালয় এবং গ্রামের বিভিন্ন মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৪২ সালে তিনি বারোয়ারী কালীমন্দির সংস্কার করেন।

গ্রাম্য উৎসব ও ধর্মীয় চর্চা

কেশবপুরে দত্ত এবং সরকার পরিবারের পৃথক পৃথক দেবালয় রয়েছে। দুর্গা পুজো, শিব পুজো এবং হরিসভায় নাম সংকীর্তনের মাধ্যমে গ্রামটি উৎসবের দিনগুলিতে প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

এই গ্রাম শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যের এক সমৃদ্ধ কেন্দ্র হিসেবে আজও বিদ্যমান।কেশবপুর গ্রামের ঐতিহ্যবাহী পরিবার এবং তাদের অবদান

সাহা পরিবার

কেশবপুর গ্রামের সাহা পরিবার তাদের বিশাল প্রাসাদোপম অট্টালিকার জন্য পরিচিত। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে কৈলাস সাহা এবং তার ভাই ভুবনেশ্বর সাহা এই বাড়িটি নির্মাণ করেন। বাড়িটির বিশেষত্ব ছিল একটি গোপন ধনাগার, যা বাইরের কোনো প্রবেশপথ ছাড়াই দ্বিতল থেকে ভূগর্ভে একটি ঘুরন্ত সিঁড়ি দিয়ে সংযুক্ত ছিল। সাহা পরিবার গ্রামের বারোয়ারী কালীমন্দিরের পূজা পরিচালনার জন্য জমি দান করেন। এছাড়া তারা ছোট জমিদারি এবং কলকাতায় ব্যবসা পরিচালনা করতেন।

ঘোষ পরিবার

ঘোষ পরিবার কেশবপুর গ্রামের একটি উল্লেখযোগ্য অভিজাত পরিবার। শৈলধর ঘোষ, এই পরিবারের উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব, ১৮৯৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তার পূর্বপুরুষ মকরন্দ ঘোষ রাজা বল্লাল সেন কর্তৃক কৌলিন্য প্রাপ্ত হন এবং পরবর্তীতে বিজয়রাজ ঘোষ কেশবপুর গ্রামে বসবাস শুরু করেন। এই পরিবারটি সমাজকল্যাণমূলক কাজের জন্য সুপরিচিত, যেমন দেবালয় নির্মাণ, পুষ্করিণী খনন এবং দুর্গা পূজা আয়োজন।

শৈলধর ঘোষের আর্থিক অবস্থা তার শৈশবে নিম্নমুখী হলেও, তিনি তার কর্মদক্ষতা ও ব্যবসায়িক দক্ষতার মাধ্যমে নিজের উন্নতি সাধন করেন। তিনি ১৯১১ সালে মধ্য ইংরেজি বিদ্যালয়ের পড়াশোনা শেষ করেন এবং পরে একজন মহৎ ব্যবসায়ী হিসেবে নিজের নাম প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি হুগলি জেলার বোর্ডের সভাপতি হিসেবে কাজ করেন এবং এলাকার উন্নয়নে তার অবদান ছিল অনস্বীকার্য।

শৈলধর ঘোষের সমাজসেবা

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

শৈলেশ্বর ঘোষ ছিলেন একজন প্রকৃত সমাজসেবক এবং দেশপ্রেমিক। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সাহায্য করার পাশাপাশি তিনি কংগ্রেস সংগঠনের সভাপতি অতুল্য ঘোষ, মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল চন্দ্র সেন, এবং কবি রত্নমনি চট্টোপাধ্যায়ের মতো ব্যক্তিত্বদের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রেখেছিলেন।

গ্রামের উন্নয়নে তার অবদান অগ্রগণ্য। বিদ্যালয়, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, পথনির্মাণ, সেচব্যবস্থা এবং কৃষিক্ষেত্রে উন্নতির জন্য তিনি ব্যাপক সহযোগিতা করেছিলেন। দুঃস্থদের তিনি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতেন এবং বহু বেকার যুবককে চাকরির সংস্থান করে দিয়েছিলেন।

সাহা ও ঘোষ পরিবারের অবদান কেশবপুর গ্রামকে ঐতিহাসিক ও সমাজকল্যাণমূলক কাজের জন্য এক অনন্য স্থানে উন্নীত করেছে। এ গ্রাম শুধুমাত্র তাদের ঐতিহ্যের জন্য নয়, বরং তাদের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের জন্যও স্মরণীয়। কেশবপুর গ্রাম সত্যিই একটি রত্নগর্ভা স্থান।

কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম মহাবিদ্যালয়: কেশবপুরের শিক্ষা ক্ষেত্রে এক মহতী অধ্যায়

২০০৭ সালে কেশবপুরে প্রতিষ্ঠিত হয় কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম মহাবিদ্যালয়, যা এই অঞ্চলের মহান কবি চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের রচয়িতা মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর নামে নামাঙ্কিত। কেশবপুর গ্রামের মতো একটি প্রত্যন্ত অঞ্চলে মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা নিঃসন্দেহে এখানকার মানুষের জন্য এক মহার্ঘ উপহার। শিক্ষা প্রসারে এই মহাবিদ্যালয় কেশবপুর গ্রাম এবং সংলগ্ন এলাকার একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠেছে।

প্রতিষ্ঠার পটভূমি

মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পেছনে ছিলেন কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তি, যাঁরা স্বপ্ন দেখেছিলেন গ্রামাঞ্চলে উচ্চশিক্ষার প্রসার ঘটানোর। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন নিমাই মাল (প্রাক্তন গ্রন্থাগার মন্ত্রী), রামকৃষ্ণ ব্যানার্জি এবং বাবলু দেব দত্ত (শিল্পপতি), ডা. অভয় পদ দাস, শরদিন্দু ঘোষ (প্রাক্তন প্রধান, মলয়পুর-২), সুদাম পাত্র (প্রাক্তন প্রধান, মলয়পুর-২), হিমাংশু বসু (প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক, কেশবপুর পাবলিক লাইব্রেরি), এবং সর্বানন্দ ঘোষ। এঁদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলেই মহাবিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়।

বর্তমান নেতৃত্ব ও অবদান

মহাবিদ্যালয়ের উন্নয়নে বর্তমানে নেতৃত্ব দিচ্ছেন মাননীয়া অধ্যক্ষা মহামায়া লাহা মুখার্জি এবং প্রাক্তন বিধায়ক ও হুগলি জেলার সহ-সভাপতি কৃষ্ণচন্দ্র সাঁতরা। কৃষ্ণচন্দ্র সাঁতরা বর্তমানে মহাবিদ্যালয়ের গভর্নিং বডির সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তাঁদের কার্যক্রম এবং নেতৃত্বের মাধ্যমে মহাবিদ্যালয়টি ক্রমাগত উন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে।

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

Poem

A Disturbed World

Kornelius Hembram

Assistant Professor in English

A Complete World well known for 28 years,

With other small worlds within it comfortably connected.

Happiness lived with them happily making them happy,

Sadness' partial blow did not have a lasting impact on them.

They lived forgetting the truth which is death to recollect,

Until the day, when a strong wind blew them away,

Shattering a beautiful world to a deadly shattered.
Popsy world where love knows no bound,

But admonish becomes a free gift in case of mischievous,

An alluring gift 'patience' to steal as a dweller of this state.

Astonishing fact is that other seven micro worlds with the macro peacefully relied,

Without having any rage, due to the amalgamation of godly virtues,

But alas! Now may be gazing at those left worlds like the moon at the earth at night.

Momsey a pious world and power house of love and affection, still in there,

Bruvy world once a burden carrier and terrifier especially for sibling worlds,

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

কফিনবন্দী আমি

ড. তপন কুমার বালা, অধ্যাপক বাংলা বিভাগ

আমি মগ্ন আছি
তোমার গন্ধবকুল
মোহে, অন্য কারুর
মোহে মগ্ন নই যে আমি। আমি
অপেক্ষারত তুমি আসবে বলে, এলে
না তুমি, মন তাই খুব বিষণ্ন আমার।
কেন এলে না এই হতভাগার বাসরে
তুমি? যদিও এ প্রশ্ন করা আমার
কিংকর্তব্যবিমূঢ়; কেননা সে অধিকার
আমাকে দাওনি তুমি। যদিও তোমার
নয়নে নয়নে কফিনবন্দী আমি।
তুমিও যে মোর চোখের তারা, আগুন
পাখি; পরতে পরতে তোমার সাথে
জড়িয়ে আছি। অধিকার হয়তো
কেড়ে নিতে হয় নিঃশব্দে কিন্তু
পারিনা, কিংবা হয়তো আমি অপারগ
তাই আমি একা, নিঃসঙ্গতায় ব্যর্থ
প্রেমিক। চোখের ঐ পলকে পল্লবিত
মন যে আমি চন্দ্রাহেরি মুখখানি যেন
চাঁদের কিরণ হাসি ঠোঁটের নিচে
মনচোরা হাসি মনে ধরে রাখি। ওগো
দেখ দেখি আজি চাঁদের কিরণ লাগি
যুগলদন্ত বিদ্যুৎ-আলোয় মন যে করে
চুরি। গোছাভরা চুলের ঐ তরঙ্গে
ভাসি ঢেউ তরঙ্গে। তোমার শাড়ির
ভাঁজ আমার জীবনের সাজ।
শরীরের ভাঁজে ভাঁজে ঐ খাঁজ যেন
চাঁদের ছায়া তোমার শরীর ছুঁতেই
মন যে কেমন যেন করে এমন বুঝি
ওগো সহিতা তোমারও করে বুঝি।
রঙ্গিলা মনগো রাঙ্গিয়ে দিলে মন যে
আমারই আমার রঙ্গিন মন বুঝি, মন
যে শুধু তোমারই রঙ্গিন মন যে
কিছুই চায়না, শুধু চায় তোমারেই
বাস্তবে না হোক, কল্পনায় শুধু তুমি
আমারই। আমার রোমান্টিক মন
পারেনি ব্যক্ত করতে। তাই আমি
একা, নিঃসঙ্গতায় ব্যর্থ প্রেমিক।
যখন তুমি আমাকে জড়িয়ে ধরে
চুম্বন করো; শরীর আমার কেমন
যেন অসাড় হয়ে যায়। তোমার
শরীরের সঙ্গে আমার শরীর মিশে
যায়, নরম বুকের স্পর্শে বুক আমার
যুক্ যুক্ করে; আমি ঝাপটা মেরে
বেরিয়ে আসার চেষ্টা করি। কিন্তু
পারিনা, যতই চেষ্টা করি ততই
শরণাপন্ন হই। কারণ আমি
কফিনবন্দী তোমার অনুভব-অনুভবে।
প্রেম স্রোতে প্রেম তরঙ্গে ভাসাইলাম
নায়ে পাল তুলে ওগো সহিতা
তোমার প্রেমে
আজি ফেরারী
আমি।
কফিনবন্দী আমি,
অনুভূতি তোমার
ভালোবাসায়। মুক্ত বিহঙ্গ আমি,
মোহের বন্ধন থেকে মুক্তি চাই।
তবে বৈরাগ্য সাধনে সে আমার
মুক্তির পথ নয়। কারণ মন যা চায়,
চায় শুধু স্বপ্নালু মন তোমারেই;
করিলে রূপ-লাবণ্য জ্যোতিতে মন
হরণ আমারই। তাই ঘুরে ফিরে
রঙ্গিলা তোমায় শুধু আমি খুঁজি।
ওগো সহিতা, তুমি আমার স্বপ্নালু
নায়ের রঙ্গিলা মাঝি, তাই কফিনবন্দী
অনুভূতি মুক্তির ভাষা তুমিই।

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম
মহাবিদ্যালয়

Kabikankan Mukundaram Mahavidyalaya

CERTIFIED ISO 9001:2015 COMPANY

Affiliated to the University of Burdwan
Keshabpur, Arambagh, Hooghly, 712413

ISO 14001:2015

Scanned with OKEN Scanner